'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রথম সংখ্যা

Approved by the Central Text-book Committee for Juvenile reading.
(*Vide* 558 T. B. dated 4-9-36 & 241 T. B. dated 23-4-40.)

কি ও কেন ?

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

তৃতীয় সংস্করণ

বেঙ্গল মাস্ এডুকেশন সোসাইটী
৯৯।১ এফ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার,
কলিকাতা।

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক—

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এস, সি

৯৯।১ এফ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

এস, সি, বসু

বোস প্রেস,

৩০ নং ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণের কথা

এই সংস্করণে বিষয়বস্তু অনুযায়ী লেখাগুলিকে সাজান হইয়াছে এবং প্রয়োজনানুরোধে বহু নূতন বিষয় সংযোজিত করা হইয়াছে।

সুখের কথা—দেশে বিজ্ঞান আলোচনা বাড়িতেছে। আমি এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি। শিশুপাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেরাই দয়া করিয়া আমার নিকট হইতে পুস্তকখানি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সাধারণের বিজ্ঞান আলোচনার সুবিধা হইবে বলিয়া অতি সরল ভাষায় বিজ্ঞানের মোটামুটি বিষয়গুলি ক্রমশঃ বার ভাগে প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকখানি উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড; ২য় 'বিচিত্র এই সৃষ্টি', ৩য়, 'অদ্ভুত কথা' প্রকাশিত হইয়াছে। ৪র্থ 'কারিগরের বাহাদুরি' পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। অবশিষ্ট আটখানি পুস্তক এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বাংলা ভাষায় এরূপ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন বলিলেই হয়। আশা করি সুধী সমাজ সম্পূর্ণ পুস্তকমালার গ্রাহক হইয়া আমায় উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

:৩ই ভাদ্র, ১৩৪৭ গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জল ও বায়ু ব্যতীত জীব বাঁচিতেই পারে না। এই জল কি? ইহার ধর্ম্ম কি? এ বিষয়ে একটা মোটামুটী ধারণা তোমাদের থাকা দরকার।

হাইড্রজন্ ও অক্সিজন্ নামক দুইটী গ্যাসের মিলনের ফলে জলের সৃষ্টি হয় এই জল রাসায়নিকের চক্ষে খুব খাঁটি হইলেও খাইতে অতি বিস্বাদ। এই জলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের বায়ু এবং নানা জাতীয় লবণ গলিয়া থাকে বলিয়া জল এত আস্বাদযুক্ত হয়।

জলকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গিলে আমরা উক্ত দুইটি গ্যাস পাই। তাহা বলিয়া মনে করিও না, আমরা উক্ত গ্যাস দুইটি মিলাইয়া আমাদের ব্যবহারের জল তৈয়ারী করিয়া লই! পৃথিবী সৃষ্টির আদি যুগে, যখন পৃথিবী সবে মাত্র সূর্য্যের গর্ভ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া অতি তপ্ত নানা বাষ্পের কুণ্ডলীরূপে মহাকাশে ঘুরিতেছিল, তখন অতি তপ্ত বাষ্পীয় ধরার গর্ভে নিয়ত অতি ভীষণ বিস্ফোরণ চলিতে থাকিত। সেই সময় নিয়ত বিস্ফোরণ ফলে হাইড্রজন ও অক্সিজন মিলিয়া জলীয় বাষ্প হইয়া থাকিবে। তাহার পর ক্রমশঃ তপ্ত ধরা অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে তাহাই ধরার বুকে বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর নিম্নভূমিগুলি পূর্ণ করিয়া সাগর, হ্রদ, তড়াগাদি সৃষ্টি করিয়াছে।

জল ও বায়ু

জলের নীচে আমরা বাস করিতে পারি না কেন ?

আমাদের বাঁচিবার জন্য অনবরত পরিষ্কার অক্সিজন পূর্ণ প্রাণ-বায়ু আবশ্যক। আমাদের ফুস্‌ফুস নাক দিয়া গৃহীত এই বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইয়া কাজে লাগায়। জলে প্রথম নিশ্বাসেই খানিক জল ঢুকিয়া ফুস্‌ফুস্ ভরিয়া উঠে; তখন ফুস্‌ফুসের কাজ করিবার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। ফলে বায়ুর অভাবে আমরা হাঁফাইয়া মরিয়া যাই।

তবে জলে মাছ বাঁচিয়া থাকে কেন ?

মাছ আমাদের মত নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে না; তাহারা তাহাদের কান্‌কো দিয়া নিশ্বাস লইয়া থাকে। কান্‌কোগুলি এমন সুকৌশলে গঠিত যে জল

াহা ভেদ করিয়া মাছের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। জল হইতে কেবল ..ত্র বায়ুটুকু সে ছাঁকিয়া গ্রহণ করে এবং জল জলেই পড়িয়া থাকে। মাছের াকো জল ছাঁকুনির মত কাজ করে। চিত্রে দেখিবে যে জল কান্‌কোর ভ ের দিয়া পার হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এই সময় মাছ কান্‌কোর াহায্যে জলের বায়ুটুকু গ্রহণ করে। এইরূপে কান্‌কোর সাহায্যে জলের ও বিশুদ্ধ বায়ু পাইয়া মাছ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

.ছকে জল হইতে তুলিলে উহা মরিয়া যায় কেন ?

মাছ কেবল মাত্র তাহার কান্‌কো দিয়াই নিশ্বাস লইতে পারে। কান্‌কো ুমিশ্রিত জল হইতে জল ছাঁকিয়া মাত্র বায়ুটুকু গ্রহণ করে। জল হইতে ুললে কান্‌কো জলের অভাবে শুকাইয়া অকেজো হইয়া পড়ে, সেই জন্য বায়ু অভাবে মাছ দম বন্ধ হইয়া মারা যায়।

গরম জল খাইতে বিস্বাদ কেন ?

জল ফুটাইবার সময় জলের বায়ু উড়িয়া যায়। জল বায়ুর অভাবে বিস্বাদ হইয়া পড়ে। উহাকে ভাল করিয়া 'ঢালা উপুড়' করিয়া লইলে উহাতে বায়ু মিশ্রিত হওয়ায় জলের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া আসে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)

জলে কতক জিনিস ডোবে এবং কতক জিনিস ভাসেই বা কেন ?

একটা কোন জিনিস লওয়া যাক্। ধর লোহা জলে ডোবে। যতখানি আয়তনের (volume) লোহা লইবে, ঠিক ততখানি আয়তনের জল লইলে

দেখিবে যে জল অপেক্ষা লোহাটুকু ভারী; সেই জন্য লোহাটুকু জলে ডুবিয়া যায়।
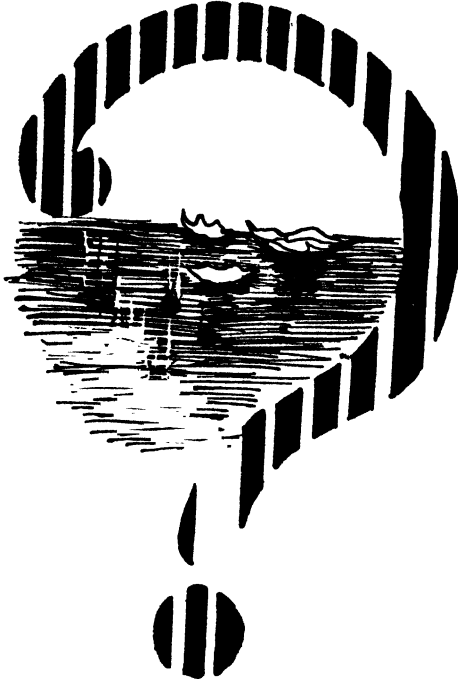
ধর কাঠ জলে ভাসে। যতখানি আয়তনের কাঠ লইবে ঠিক ততখানি আয়তনের জল লইলে দেখিবে যে কাঠটুকু জল অপেক্ষা হাল্কা। সেই জন্য কাঠ জলে না ডুবিয়া ভাসিয়া উঠে।

একই আয়তনের কোন দ্রব্য যদি জল অপেক্ষা হাল্কা হয় তাহা হইলে জলে ভাসিবে এবং যদি ভারী হয় তাহা হইলে ডুবিয়া যাইবে।

[প্রত্যেক জিনিসের একই আয়তন জলের তুলনায় একটা নির্দ্দিষ্ট গুরুত্ব

আছে। এই সংখ্যাকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। জলের অপেক্ষা কোন জিনিস ভারী হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ অপেক্ষা বেশী এবং হাল্কা হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ এর অপেক্ষা কম। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ধরা হয়।

কোন জিনিসের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানিতে হইলে একই আয়তনের জলের ওজন দিয়া সেই জিনিসের টুকরার ওজনকে ভাগ দিতে হয়। জিনিসের আয়তন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইলে কোন ক্ষতি নাই, সকল সময়েই একই ফল পাওয়া যাইবে।]

তবে লোহার পাতে মোড়া ভারী জাহাজ জলে ডোবে না কেন?

একটি যুদ্ধের জাহাজের ওজন প্রায় চল্লিশ লক্ষ মণ। এত ভারী হইয়াও ইহা জলে ভাসে তাহার কারণ ইহার খোল এত বড় যে ঐ আয়তনের সমুদ্রের জল ঐ জাহাজ অপেক্ষাও ভারী। একই আয়তনের সমুদ্রের জল অপেক্ষা জাহাজ হাল্কা হওয়ায় উহা সমুদ্রে ডোবে না।

জলের চাপ

জলের খুব বেশী নীচে নামিলে মানুষ আর উপরে উঠিতে পারে না কেন?

জলের একটা ভার আছে। মানুষ কেন, সকল জীবেরই ভার সহিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেই সীমা পার হইলে, মানুষ উপরের জলের ভারে চাপ ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না, তলাইয়া যায়। তবে যদি খুব ভার সহ করিতে পারে এমন কোন ইস্পাতের খোলের ভিতরে মানুষকে বসাইয়া

জলে নামান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারা যায়। এই রকম করিয়া ডুবরীরা সমুদ্রের বহু গভীর প্রদেশে নামিয়া কাজ করে :

অনেক সময় দেখা যায়, বড় বড় তিমি মাছ [ইহারা আমাদের মত নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে] শিকারীদের বর্শার আঘাতের ভয়ে সমুদ্রের এত বেশী তলে গিয়া পড়ে যে আর জলের চাপ ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না।

কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে বহু প্রকারের ক্ষীণজীবি জীব বাস করে কিরূপে ? জলের বিরাট চাপে মরিয়া যায় না কেন ?

এই জীবগুলির শরীরের গঠন অতি অদ্ভুত। তাহাদের দেহে এফোঁড় ওফোঁড়ে বহু ছিদ্র আছে। ঠিক যেন ফারফোর তাগা বা ঝাঁঝরা। সেই জন্য জল দেহের এপার ওপার হইতে পারে বলিয়া দেহে জলের চাপ লাগে না।

এইরূপে সমুদ্রের যে যে স্তরে যে প্রকার জীব বাস করে, তাহাদের সেই সেই স্তরের জলের চাপ সহ্য করিবার উপযোগী দেহে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

জল ও লবণ

সমুদ্রের জল নোনা কেন ?

সমুদ্র যখন প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন উহার জল বেশ পরিষ্কার ও সুস্বাদু (**fresh**) ছিল। তাহার পর পাহাড় হইতে নদীগুলি যখন ক্রমশঃ নানা দেশ বাহিয়া মাটী প্রস্তরাদি ধুইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন হইতে সমুদ্রের জল অপরিষ্কার হইতে লাগিল। মাটী ও প্রস্তরাদির মধ্যে নানাজাতীয় লবণ আছে ; সেগুলি এইরূপে বহুযুগ ধরিয়া নদীর জলের সহিত আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ফলে ক্রমশঃ সমুদ্রের জল নোনা হইয়া উঠিতেছে।

Dead Sea কে dead (মৃত) বলে কেন ?

ইহা পূর্ব্বে সমুদ্রের অংশ ছিল। এখন আরবীয় মরুভূমির মধ্যস্থিত এই হ্রদের জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে ; কিন্তু কোন নদীই টাট্‌কা জল লইয়া ইহাতে পড়িয়া তাহা পূরণ করে না। ফলে এই হ্রদের জলে দিন দিন নুনের ভাগ বেশী হইয়া পড়ায় এই জল এত নোনা যে ইহাতে কোন জলচর জীবই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে এই মরুহ্রদটি জীবহীন হইয়া পড়ায় ইহাকে মৃত হ্রদ (**Dead sea**) বলে।

বর্ষাকালে নুন খুব ভিজা থাকে কেন ?

বর্ষাকালে বায়ু মণ্ডলে অত্যধিক বাষ্প থাকে। নুন তখন প্রচুর পরিমাণে আকাশ হইতে জল টানিতে পারায় ভিজিয়া যায়।

নুনের এই জল টানিবার গুণ হইতে আমরা সহজেই আসন্ন আবহাওয়ার বিষয় জানিতে পারি। নুন শুষ্ক থাকিলে বুঝিতে হইবে বর্ষা দূরে, নুন ভিজিতে আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে বর্ষা আসন্ন।

সমুদ্রে স্নান করিলে ভিজা কাপড় শুকাইতে চায় না কেন ?

সমুদ্রের নোনা জলে স্নানের সময় কতক নুন কাপড়ে লাগিয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প হইতে জল শুষিবার ক্ষমতা নুনের আছে। তোমরা বাড়ীতে বর্ষাকালে নুনের পাত্রে জল দেখিয়া থাকিবে। এইজন্য কাপড় শুকাইতে দিলে কাপড়ে লাগা নুন বায়ু মণ্ডলের জল টানিতে থাকায় কাপড় শীঘ্র শুকাইতে চায় না। অন্য টাটকা জলে কাপড় আর একবার কাচিয়া লইলে, নুন ধুইয়া যায়। তখন আর কাপড় শুকাইতে বিলম্ব হয় না।

সমুদ্রের জল কম বেশী নোনা কেন ?

যে সকল সমুদ্রে নদীর টাট্‌কা জল পড়ে না, সেখানকার জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবার ফলে নুনের ভাগ বাড়িতে থাকে বলিয়া সেই স্থানের

জল খুব বেশী নোন্‌তা হয়। আবার যে সমুদ্রে বহু নদীর টাট্‌কা জল গিয়া মিশে, সেখানে বাষ্প হইয়া জল উড়িয়া গেলেও ক্রমাগত প্রচুর টাট্‌কা জল আসায় সমুদ্রের জল বেশী নোন্‌তা হইতে পায় না।

সমুদ্রে কোথাও কম বেশী টাট্‌কা পানীয় জল পাওয়া যায় কেন ?

নোন্‌তা জলে নুন থাকায় টাট্‌কা (fresh) জল অপেক্ষা ভারী। সেই জন্য যেখানে খুব বড় নদী সাগর সঙ্গমে প্রচুর টাট্‌কা জল ঢালে, সেখানে সমুদ্রের নোনা জল থাকে নীচের স্তরে এবং নদীর টাটকা জল তাহার উপরে ভাসিতে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজনের (Amazon) মত বিরাট নদ আটলাণ্টিকের যে স্থানে তাহার অফুরন্ত জলভার ঢালে, সমুদ্রের সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত ঐ নদের টাট্‌কা জলের স্রোত সমুদ্রের নোনা জলের উপর বহিতে থাকে। তাই নাবিকেরা পাত্র ডুবাইয়া জল তুলিলেই টাট্‌কা জল পায়। কিন্তু সেখানেও যদি সমুদ্রের গভীর প্রদেশ হইতে জল তোলা হয় তাহা হইলে নোনা জলই পাওয়া যাইবে।

বাষ্প—জলের বায়বীয় রূপ

শুষ্ক কাচের বা ধাতুর পাত্রের মধ্যে বরফ জল রাখিলে পাত্রের বহির্দ্দেশে ঘাম হয় কেন ?

বায়ুমণ্ডলে সকল সময়েই জল বাষ্পাকারে থাকে। বায়ু মণ্ডলের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাষ্পাকারে জল ধারণ করিবার শক্তি বাড়ে এবং শীতলতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তি কমে.।

পাত্রের শীতল জলের জন্য পাত্রের গাত্রও অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে এবং চারি পাশের বায়ু গাত্রে ঠেকিবামাত্র বায়ুস্থিত বাষ্প জমিয়া জল হইয়া পাত্রের গাত্র দিয়া গড়াইয়া পড়ে ; সেই জন্য মনে হয় পাত্রটী ঘামিতেছে।

মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় কেন ?

গরম জলের ধোঁয়া বা বাষ্প তোমরা বোধ হয় উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছ। গরম হইলেই সে জিনিসটী তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে লঘু হয়। এই বাষ্প আকাশের স্থানে স্থানে জড় হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘ যখন উপরে উঠিয়া কোন শীতল বাতাসের স্তরের সংস্পর্শে আসে তখন ইহা জমিয়া আবার জল হইয়া যায়। এবং জল বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া বৃষ্টি রূপে মাটিতে পড়িতে থাকে।

শীতকালে কুয়াসা হয় কেন ?

সকল সময়েই নানা জলাশয় হইতে জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিতে থাকে। শীতকালে এই বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে উঠিতে না উঠিতে অতি শীতল বায়ুস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া জমিয়া অতিক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। ভূমির নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে ভাসমান এই অতি ক্ষুদ্র জলকণারাশি ধোঁয়ার মত দেখায়, ইহাকে লোকে কুয়াসা বলে।

ঘাসের উপর শিশির পড়ে কেন ?

সূর্য্যাস্তের পর ঘাস, গাছের পাতা শীঘ্রই শীতল হইয়া পড়ে এবং রাত্রে মাটী হইতে বাষ্প উঠিলেই, ঐ শীতল ঘাস, পাতার সংস্পর্শে আসিবামাত্র ঠাণ্ডায় জমিয়া শিশির কণায় পরিণত হয়।

শীতকালে আমাদের নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হয় কেন ?

শীতকালে বাহিরের আকাশ এত ঠাণ্ডা যে দেহের গরম বাতাস নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে বাহির হইবামাত্র, তাহার মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প জমিয়া অতিক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। এইগুলিকে আমরা ধোঁয়ার মত দেখিতে পাই।

কুয়োর জল শীতকালে গরম এবং গরম কালে এত ঠাণ্ডা হয় কেন ?

কুয়োর জল মাটীর নীচে থাকে বলিয়া গরম কালে সূর্য্যের তাপ ততদূর নীচে বেশী পৌছিতে পারেনা ; সেইজন্য কুয়োর জল বেশী তাতিতে পারে না। এদিকে বাহিরের বাতাস বড়ই গরম সেইজন্য কুয়োর জল তুলিলে তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়।

শীতকালের বায়ুর শীতল স্পর্শ কুয়োর নীচে বেশী পৌছিতে পারে না। সেইজন্য কুয়োর জল খুব বেশী ঠাণ্ডা হইতে পারে না। এ দিকে বাহিরের হাওয়া বড়ই ঠাণ্ডা সেইজন্য কুয়োর জল তুলিলে তুলনায় বেশ গরম বলিয়া বোধ হয়।

জল ও আগুন

জল আগুন নিভায় কেন ?

বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজন গ্যাস আছে, সেইটির সহিত দাহ্য পদার্থের মিলন ঘটিতে না পাইলে, সেটী জ্বলিতে পারে না। অতএব বায়ুর এই গ্যাসের সঙ্গ

কোন জ্বলন্ত জিনিসের মিলন বন্ধ করিতে পারিলেই আগুন নিভিয়া যাইবে। আগুনের উপর জল ঢালিয়া দিলে ;

(ক) জল আগুনের তাপে বাষ্প হইয়া বায়ু ও আগুনের মাঝে একটা পর্দ্দার সৃষ্টি করে।

(খ) জলে জ্বলন্ত জিনিসটী ভিজিয়া গেলে শীঘ্র পুড়িতে পারে না।

(গ) আগুনের আশপাশের অংশগুলি ঠাণ্ডা করিয়া আগুন বাড়িবার পথ বন্ধ করে।

কেরোসিন তৈলে আগুন ধরিলে জলে নিভে না কেন ?

তেল জলের অপেক্ষা লঘু বলিয়া জল ঢালিলেই তেল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ফলে বায়ুর সঙ্গে তেলের সম্পর্ক ঘুচে না বলিয়া আগুন নিভিতে চায় না। এই সকল ক্ষেত্রে বালি বা মাটি চাপা দিয়া বাতাসের সংস্পর্শ ঘুচাইতে হয়, তাহা হইলে আগুন নিভিয়া যায়।

লোহায় মরচে ধরে কেন ?

লোহায় জল লাগিলে লোহার উপরে একটা লালচে দাগ পড়ে। ইহাকে আমরা সাধরণতঃ মরচে বলি। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন (Red oxide of Iron) রেড্ অক্সাইড্ অফ আয়রণ। বায়ুতে অক্সিজন বলিয়া একটি গ্যাস থাকে, তাহাই লোহার সঙ্গে মিশিয়া এই মরচের সৃষ্টি করে। জল এই মিলনে সাহায্য করে মাত্র। বায়ুমণ্ডলের প্রচুর জল থাকায় অতি সাবধানে লোহার জিনিষ রাখিলেও কালে তাহাতে মরচে ধরে। সেইজন্য লোহার কড়ি, বরগা, গরাদে ইত্যাদির উপর রং মাখাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। রং মাখাইলে জিনিষ দেখিতে সুন্দর হয় এবং বায়ু লোহার সহিত মিশিতে পায় না বলিয়া সহজে মরচে ধরে না।

বরফ—জলের কঠিন রূপ

শিলাবৃষ্টি হয় কেন ?

মেঘ ঠাণ্ডায় জমিয়া জল হয়। কিন্তু মেঘ যদি হঠাৎ অতি শীতল বায়ু-স্রোতের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে, তখন জলও আর তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না। উহা জমিয়া টুকরা টুকরা বরফের আকার ধারণ করে। এই বরফের টুকরাগুলি মাধ্যাকর্ষণের ফলে ধরাপৃষ্ঠে সশব্দে নামিয়া আসিলে শিলাবৃষ্টি হয়।

চন্দ্র মণ্ডল হয় কেন ?

প্রায় সাত আট মাইল উচ্চে এক প্রকার অতি লঘু মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, এই মেঘকে লোকে সিরাস্ (Cirus) বলে। আকাশের ঐ স্তর এত ঠাণ্ডা যে মেঘ খুব পাতলা ও লঘু বরফের আকারে জমিয়া ভাসিতে থাকে। এই পাতলা ও স্বচ্ছ বরফের টুকরা গুলিতে চাঁদের আলো পড়িয়া ভেদ করিবার সময় ঠিক যবকাঁচের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিবার সময় যেমন রামধনু রংএর সৃষ্টি করে; সেইরূপ হয়। গোল চাঁদের চারিপাশের আলো ঐরূপ বরফের টুকরাগুলির মধ্য দিয়া আসায় আমরা গোলাকার রামধনুর মত চাঁদের চারিদিকে একটা মণ্ডল দেখি। ইহাকেই কেহ চন্দ্রমণ্ডল বলে, আবার কেহ বা চন্দ্রের সভা বলে।

জলে বরফ ভাসে কেন ?

জল জমিয়া বরফ হয়। জল শীতে জমিয়া বরফ হইবার পূর্ব্বে সামান্য ফাঁপিয়া উঠে, সেইজন্য অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। এই জন্য বরফ জল অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে।

বরফ জল অপেক্ষা অতি সামান্য হাল্কা বলিয়া বরফের অধিকাংশই জলের নীচে থাকে, সামান্য অংশ উপরে ভাসিতে থাকে।

মেরু সমুদ্রে যখন পর্ব্বতাকার হিমশিলা [ice bergs] ভাসিতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে উপরের ভাসমান অংশের প্রায় দশগুণ জলের নীচে ডুবিয়া আছে।

জলের সমতলত্ব

কোন কোন স্থানে নলকূপ বসাইলে জল ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া ফোয়ারার সৃষ্টি করে কেন ?

বৃষ্টির জল চুয়াইয়া মাটীর ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই জল জমিয়া মাটীর নীচে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্তঃসলিলা ফল্গুর (নদীর) সৃষ্টি করে। মাটীর

নীচে এই নদীগুলি বাঁকা, সোজা, উঁচু, নীচু নানাস্তরে, যেদিকে পথ পায় সেইদিকে বহিয়া থাকে।
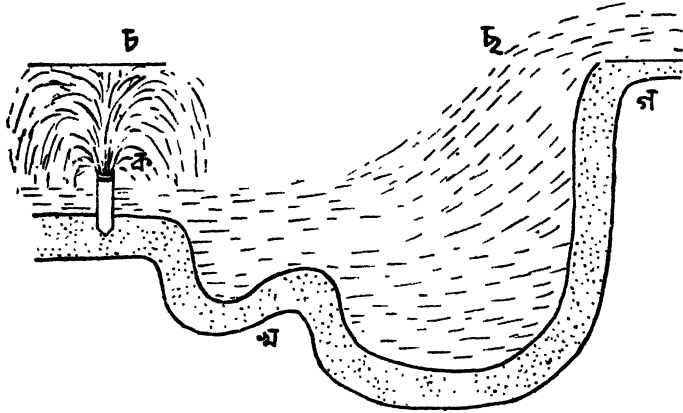
নলকূপ বসাইবার সময় এই নদীপথে নল পড়িলে এইরূপ ফোয়ারার (Artisan well) সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রে একটী মাটার নীচের নদীপথ (খগ) দেখান হইল।

কোন জলাশয়ের এক অংশে যে উচ্চতায় জল থাকিবে, অন্যান্য অংশগুলিতেও, কোন বাধা না থাকিলে বা বাধা অপসারিত হইলে, জলের দুটী মাথা সমান না হওয়া পর্য্যন্ত, নীচুস্তরের মুখ দিয়া উঁচুস্তরের মাথা পর্য্যন্ত জল উঠিবে—ইহাই হইল জলের ধর্ম্ম।

অন্তঃসলিলা খগ নদী পথের গ এর স্তর ক কূপমুখ অপেক্ষা উচ্চ। সেইজন্য ক স্থানে নলকূপ বসাইলে, ঐ স্থানে জলের উপরের বাধা অপসারিত হওয়ায় গ মাথার উপরের জলের চাপে ক মুখে জল বেগে উপরে উঠিয়া চ ছ মাথা পর্য্যন্ত উঠিতে গিয়া ফোয়ারার সৃষ্টি করিবে।

কাঠ বহুদিন জলে ডুবাইয়া রাখিলে লঘুত্ব হারাইয়া ফেলে কেন ?

কাঠ অসংখ্য ছিদ্রপূর্ণ। এই ছিদ্রগুলি বায়ুতে ভরিয়া থাকে। সেইজন্য কাঠ জল অপেক্ষা লঘু হয়। বহুদিন জলে থাকিবার ফলে এই ছিদ্রগুলিতে জল ঢুকিয়া বায়ুর স্থান গ্রহণ করে। ফলে ইহা লঘুত্ব হারাইয়া ফেলে।

লঘু কাঠের টুক্‌রা সমুদ্রের গভীর প্রদেশে জোরে নামাইয়া আবার তুলিবার পর দেখা গিয়াছে যে কাঠের টুকরা আর জলে ভাসে না। সমুদ্রের জলের চাপে কাঠের অসংখ্য ছিদ্রে জল প্রবেশ করিয়া বায়ুর স্থান গ্রহণ করায় কাঠ ভারী হইয়া পড়িয়াছে।

বায়ু কি ?

জল যেমন দুইটি গ্যাসের মিলনে প্রস্তুত হইয়াছে, বায়ু কিন্তু সেরূপ হয় নাই ; বায়ু কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে। ধূম কুণ্ডলী হইতে বর্ত্তমান কঠিন ধরার সৃষ্টি পর্য্যন্ত যে গ্যাসগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহাই পৃথিবীর চারিদিকে একটা মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকেই আমরা বায়ুমণ্ডল বলি।

জল হইতে হাইড্রজন্ ও অক্সিজন্ পাইতে হইলে যেমন বহু আয়াসে জলের অনু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, বায়ুর বেলায় তাহা করিতে হয় না। বায়ুর গ্যাস-গুলি মিশিয়া থাকায় ঐ গুলি তফাৎ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

সাধারণতঃ এক হাজার ভাগ বায়ুতে নিম্ন লিখিত ভাগে গ্যাসগুলি আছে।

অক্সিজন্	...	...	২০, ৬১ ভাগ
নাইট্রজন	...	...	৭৭, ০০ ,,

আরগন্	...	...	০, ৯৫ ভাগ
কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ্		...	০, ০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	...	...	১, ৪০ ,,

এবং অন্যান্য কতকগুলি গন্ধক-জাত বিষাক্ত গ্যাস নাম মাত্র আছে।

বায়ুমণ্ডরের গ্যাসগুলি পৃথক ভাবে মিশিয়া থাকায় যে জীবের যে গ্যাস দরকার সে তাহা গ্রহণ করে। প্রাণীজগৎ কেবল মাত্র অক্সিজন গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদ জগৎ কেবল মাত্র কার্ব্বন-দ্বি অক্সাইদ ও নাইট্রজন গ্রহণ করে। জলের মত গ্যাসগুলি মিলিয়া এক হইয়া থাকিলে এইরূপ করা সম্ভবপর হইত না।

বায়ু ও তাপ

বাতাস বহে কেন ?

গরম বায়ুর স্রোত ফুলিয়া উপরে উঠিয়া গেলে, তাহার স্থান লইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুস্রোত ছুটিয়া আসিলেই বাতাস বহিয়া থাকে।

গরমের দিনে বাতাস করিলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন ?

প্রথমতঃ আমাদের দেহের ঘাম হইবামাত্র গরম বাতাসে বাষ্পীভূত হইয়া যায়, ফলে ঘাম বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার সময় দেহের কতক তাপ গ্রহণ করিয়া উড়িয়া যায়। সেই জন্য দেহ খানিকটা তাপ হারাইয়া শীতল হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেহের তাপে নিকটস্থ বায়ু তাতিবার সঙ্গে সঙ্গে, বাতাস করিলে সরিয়া যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত শীতল অন্য বায়ু ছুটিয়া আসে। সেজন্যও খানিকটা ঠাণ্ডা বোধ হয়।

আগুন লাগিলে সেখানে জোরে বাতাস বহে কেন ?

আগুনের তাপে সেইস্থানের বায়ু ফাঁপিয়া লঘু হওয়ায় উপরে উঠিতে থাকে। ফলে চারিপাশের বায়ু সেই ফাঁকটুকু পূরণ করিতে ছুটিয়া আসে, এবং সেইখানকার নবাগত বায়ুরাশি গরম হইয়া ফাঁপিয়া ক্রমাগত উপরে উঠে। এইরূপ ক্রমাগত বায়ু তাতিয়া ফাঁপিয়া উপরে উঠায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে শীতল বায়ুপ্রবাহ সেই শূন্য স্থান পূরণের জন্য বেগে ছুটিয়া আসায় জোরে বায়ু বহিতে থাকে।

কলের চিম্‌নি উঁচু করা হয় কেন ?

আগুনের তাপে উপরের বায়ু ফুলিয়া উপরে উঠিতে থাকায় চারিপাশের শীতল বায়ু স্রোত বেগে আগুনের মুখে ছুটিয়া যায়। ফলে অধিক পরিমাণে বায়ু

তাড়াতাড়ি চুল্লীর মুখে প্রবেশ করায় কয়লা যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজন গ্যাস পায়, বলিয়া ভাল করিয়া জ্বলিতে পায়। ইহাতে অল্পই কয়লা নষ্ট হয় এবং অধিক তাপ সৃষ্টি হওয়ায় অল্প কয়লায় বেশী কাজ পাওয়া যায়। গৃহস্থের বাড়ীর চুল্লী নিভিয়া গেলে পাখার বাতাস দিয়া আবার আগুন ধরাইতে হয়। কিন্তু কলের চিমনী উঁচু থাকার ফলে বায়ু স্রোতের অভাব ঘটে না বলিয়া এ সকল হাঙ্গামা কখন পোহাইতে হয় না।

উঁচু চিমনী থাকায় কয়লা জ্বলিবার সময় নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া উপরের বায়ুমণ্ডলের স্রোতের মুখে গিয়া পড়ে। সেইজন্য উক্ত বিষাক্ত গ্যাস শীঘ্রই বহুদূরে আকাশে উড়িয়া যাওয়ায় আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারে না।

শুষ্ক পাট, ঘাস বা খড়ের গাদায় মাঝে মাঝে অকারণে আগুন ধরে কেন ?

পাট, খড়, ইত্যাদি জড় করিয়া রাখিবার সময় যদি কোন কারণে সামান্য ভিজিয়া থাকে তাহা হইলে কিছুদিন পরে তাহা পচিতে আরম্ভ করে। এই পচন ক্রিয়ার ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ সময় সময় সেই স্থানটুকুর পক্ষে এত অধিক হইয়া পড়ে যে সেই স্থানটুকুর খড়েতে আগুন ধরিয়া যায়। ঐ আগুন ক্রমশঃ গাদার অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ায় সমস্ত গাদা জ্বলিয়া উঠে।

গ্রীষ্মকালে মাটির নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তর কাঁপে কেন ?

গরমকালে মাটী সূর্য্যের তাপে খুব তাতিয়া উঠে, কিন্তু মাটীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল তত তাতে না। এই অতি উষ্ণ মাটীর স্পর্শে বাতাস তাতিয়া, ফুলিয়া উপরের দিকে ক্রমাগত উঠিতে থাকে, এবং চারিপাশের ঠাণ্ডা বাতাস সেই বায়ুশূন্য স্থান পূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে। পুনরায় এই তাজা শীতল বাতাস গরম মাটীর স্পর্শে তাতিয়া ফুলিয়া উপরের স্তরে উঠিয়া যায়। এই ব্যাপার

ক্রমাগত চলিতে থাকে। অনবরত এই চঞ্চল বায়ুস্তরের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া আমাদের চোখে লাগিবার সময় কম্পমান দেখায়। সেইজন্য আমরা ঐ বায়ুস্তরকে গরমকালে কাঁপিতে দেখি।

গ্রীষ্মকালে সাইকেলের টায়ারে বেশী বায়ু ভরিতে নাই কেন ?

গরমে টায়ারের বাতাস ফাঁপিয়া টায়ারকে আরও ফুলাইয়া তুলে। পূর্ব্ব হইতেই টায়ারে বেশী বাতাস পূর্ণ থাকিলে গরমের জন্য টায়ার আরও ফুলিলে ফাটিয়া যাইতে পারে।

রাত্রে ঘরের আসবাব পত্রে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় কেন ?

দিনের তাপে সকল জিনিসই একটু একটু ফাঁপে, এবং রাত্রের ঠাণ্ডায় হঠাৎ কোঁচকায় বলিয়া এইরূপ শব্দ হয়।

পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী স্তর অপেক্ষা আকাশের উচ্চস্তর সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়াও এত ঠাণ্ডা কেন ?

সূর্য্যের কিরণ আকাশ ভেদ করিয়া আসিবার সময় আমাদের বায়ুমণ্ডলকে তাতাইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িলে ধরাপৃষ্ঠ অনেকখানি কিরণ শুষিয়া তাতিয়া উঠে। এই তপ্ত স্তরের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুস্তরও তাতিয়া উঠে, সেইজন্য নীচের বায়ুস্তর কিছু বেশী গরম। কিন্তু তপ্তবায়ু উপরে উঠিবার সময় শীতল বায়ুস্তরের স্পর্শে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, সেইজন্য উপরের স্তরের বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডা।

সমতাপ বায়ুস্তর (Stratosphere) কাহাকে বলে?

গত শতাব্দী পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যতই উর্দ্ধে উঠিবে, ততই অধিকতর শীতল বায়ুস্তরে গিয়া পৌছিবে; এইরূপ ক্রমশঃ উপরে উঠিতে উঠিতে একেবারে শৈত্যের শেষ সীমায় (Absolute Zero) গিয়া পড়িতে হইবে। এক ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ একটী বেলুনে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র রাখিয়া বেলুনটী আকাশে উড়াইয়া দেন। তাহার পর বেলুনটী নামিয়া আসিলে দেখা গেল যে, উর্দ্ধে বায়ুস্তরের শীতলতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটী নির্দ্দিষ্ট স্তরে গিয়া আর বাড়ে নাই। তাহার পর দেখা গিয়াছে উক্ত স্তর হইতে ১০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত শৈত্য একই থাকে। এই দশ মাইল গভীর স্তরের শৈত্য—৫৫ ডিগ্রি [বরফের অপেক্ষা আরও ৫৫ ডিগ্রি অধিক] এই আবিষ্কারের পর অনেকে পরীক্ষা করিয়া একই ফল পাইয়াছেন। এই বায়ুস্তরের গভীরতা মেরু প্রদেশের উপর ছয় সাত মাইল মাত্র, কিন্তু বিষুবরেখার (Equator) উপরে ইহা ১০ মাইল। এই স্তরে কোন মেঘ নাই; ফলে দিনে নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যের আলোয় আলোকিত এবং রাত্রে অসংখ্য তারকামণ্ডিত আকাশ দৃষ্টি গোচর হয়। এই সমতাপ বায়ুস্তরকে Stratosphere বলে।

বায়ু ও গন্ধ

আমরা ফুলে গন্ধ পাই কেন?

ফুলে এক রকম গন্ধ তেল উৎপন্ন হয়। এই তেল বড় উদ্বায়ী (Volatile) অর্থাৎ সর্ব্বদাই বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে। সুগন্ধি ফুল মাত্রেই এই তেল জন্মায়। এই তেলের বাষ্পকণা বাতাসে উড়িয়া আমাদের নাকে আসিলে আমরা সেই ফুলের গন্ধ পাইয়া থাকি। এই জন্য আমরা যখন ফুল শুঁকি তখন বাতাসে এই ফুলের তেলের গন্ধটী পাই আর বলি ফুলটীর বেশ গন্ধ।

বায়ু ও আলোক

আমরা বায়ু দেখিতে পাই না কেন ?

কোন জিনিস দেখিতে হইলে, তাহার উপরে আলো পড়িয়া ঠিকরাইয়া আমাদের চোখে আসা উচিত। বায়ু এত স্বচ্ছ যে আলোকরশ্মি তাহার উপর পড়িয়া ভেদ করিয়া যায়, ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে ফিরিয়া আসে না। সেই জন্য আমরা বায়ু দেখিতে পাই না।

বায়ুর শক্তি
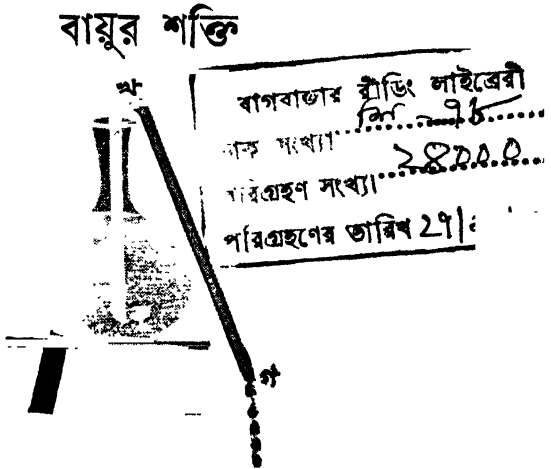
একটী জলপূর্ণ পাত্র উপুড় না করিয়া কি করিয়া খালি করিতে পারা যায় ?

একটী বেঁকান নল (চিত্রে ক খ গ) লইয়া ছোট অংশটী জলে রাখ এবং লম্বা অংশটী পাত্রের বাহিরে ঝুলিতে থাকুক। নলের গ মুখ পাত্রের তলদেশ হইতেও নীচে থাকিবে, এইবারে গ মুখে মুখ দিয়া শুষিয়া জল আনিয়া ছাড়িয়া দাও। তাহার পর পাত্র নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জল আপনি পড়িতে থাকিবে।

পিচকারী টানিলে জল উঠে কেন ?

পিচকারীর হাতল টানিলে উহার ডাঁটার সূতা বা চামড়া বাঁধান মুখটী (piston পিষ্টন) পিচকারীর খোলের উপরদিকে উঠিয়া আসে। এই সময়ে পিচকারীর মুখটী জলের মধ্যে থাকায় তাজা বায়ু ঢুকিতে পারে না ; সেই জন্য পিষ্টনের মুখের সম্মুখ ভাগ প্রায় সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য হয়। এইরূপে পিচকারীর খোলের সম্মুখ ভাগ বায়ুশূন্য হওয়ায় জল ছুটিয়া গিয়া সেই শূন্যস্থান গ্রহণ করে ; সেইজন্য পিচকারী টানিলে জল ওঠে।

বায়ুর চাপ ও ফুটন্ত তাপ-সীমা

উচ্চ পাহাড়ের উপর খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ হইতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয় কেন ?

উচ্চ পাহাড়ের উপরে উঠিলে দেখা যায় যে খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ হইতে অধিক বিলম্ব হয়। প্রায় দুইশত মাইল পুরু বায়ুমণ্ডলে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে। এই যে আমাদের মাথার উপরে প্রায় দুইশত মাইল উচ্চ বায়ুস্তর আছে, ইহারও একটা ভার আছে। এই বায়ুভার সহ্য করিতে আমরা আজন্ম অভ্যস্ত বলিয়া, আমাদের কিছুই মনে হয় না। ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ভারের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাত সের। এই বায়ুর ভারকে আমরা বায়ুর চাপ বলি।

বায়ুর চাপের সহিত জলের ফুটন্ত তাপের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সাগরপৃষ্ঠের (**Sea level**) বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাত সের বলিয়া কোন জিনিষ ফুটাইলে তাহার উপরও উক্ত চাপ প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সাধারণতঃ জানি যে ১০০ ডিগ্রি তাপে জল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়ে উঠিয়া জল ফুটাইলে দেখা যায় যে যত উচ্চে উঠা যায়, ততই অল্প তাপে জল ফুটিয়া উঠে। তখন একশত ডিগ্রির কমেই জল ফুটিতে থাকে।

উচ্চে অল্প তাপেই জল ফুটিয়া উঠে বলিয়া কোন জিনিস সিদ্ধ করিবার সময় বেশী তাপ পাওয়া যায় না, সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য পাক করিতে কিছু বিলম্ব হয়।

আবার যদি ফুটন্ত জলের উপরিভাগের বায়ুর চাপের পরিমাণ কোন প্রকারে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঠিক উল্টা ফল হয়। এই চাপ বৃদ্ধির ফলে ফুটন্ত তাপও বাড়িয়া যায়। তখন আর একশত ডিগ্রির তাপে জল ফুটে না, তখন জল ফুটাইতে হইলে বেশী তাপ প্রয়োজন হয়।

এইরূপ অবস্থা বয়লারে (boiler) ঘটিয়া থাকে। বদ্ধ বয়লারের মধ্যে বাষ্প বাহির হইতে না পাওয়ায়, জলের উপরিভাগের চাপ বৃদ্ধি পায়; ফলে জলের ফুটন্ত তাপও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ বয়লারের ফুটন্ত তাপ একশত ডিগ্রি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পের শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং অধিক তাপেও জল তত ব্যয় হয় না।

বায়ু ও প্রাণশক্তি

উচ্চস্তরে উঠিলে আমাদের নিঃশ্বাস লইতে এত কষ্ট হয় কেন?

বায়ুমণ্ডলের চাপের জন্য ধরাপৃষ্ঠের বায়ু ঘন হইয়া থাকে। এই ঘন বায়ুতে আমরা দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজন গ্যাস সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। উচ্চস্তরে বায়ুমণ্ডলের চাপ কম বলিয়া বায়ু তত ঘন নয়, সেই জন্য অক্সিজনের পরিমাণও অল্প। এইরূপ পাতলা বায়ুমণ্ডলে আমরা নিঃশ্বাস লইলে অক্সিজনের অভাব ঘটে, সেইজন্য আমরা হাঁপাইতে থাকি। এই অক্সিজনের অভাব আমরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস লইয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করি; সেই জন্য আমাদিগকে হাঁপাইতে হয়।

ফুঁ দিয়া আমরা আলো নিভাইতে পারি কেন ?

বাতাসে যে অক্সিজন্ গ্যাস আছে, সেটীর অভাবে কোন জিনিসই জ্বলিতে পারে না। ফুঁ দিলেই, আমাদের ফুঁএর সঙ্গে কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ নামে একটী অপেক্ষাকৃত ভারি গ্যাস বাহির হইয়া আসিয়া আলোর শিখাটী ঢাকিয়া ফেলিয়া অক্সিজনের যোগান বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে অক্সিজনের অভাবে আলোটি নিভিয়া যায়।

বহুদিনের পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত কূপে নামা বিপজ্জনক কেন ?

পুরাতন কূপে নানাবিধ জিনিস পচিয়া কখন কখন ভীষণ বিষাক্ত গ্যাস বাহির হয়। এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ভারি বলিয়া উপরে উঠিতে পারে না। এইজন্য

পরিত্যক্ত কূপে নানাবিধ জিনিস পচিয়া ভীষণ বিষাক্ত গ্যাস জমিয়া থাকিতে পারে। সেই জন্য কোন কোন পরিত্যক্ত কূপে নামিবার পূর্ব্বে একটি জ্বলন্ত বাতি নামাইয়া দেখা উচিত যে বাতিটী জ্বলে বা নিভিয়া যায়। বিষাক্ত গ্যাস থাকিলে বাতিটি ক্রমশঃ অক্সিজনের অভাবে নিভিয়া আসিবে। বাতিটি পূর্ব্বের মত জ্বলিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে কূপে কোন বিষাক্ত গ্যাস নাই। এই কারণেই সহরের নর্দ্দমা পরিষ্কার করিবার জন্য ম্যান হোলে (man hole) নামিয়া সময়ে সময়ে ধাঙ্গড়দের মৃত্যু ঘটে।

জ্বালানি (১)

কয়লা কি ?

যে যন্ত্রের অভাবে মানুষের এত সুখ এক নিমিষে লোপ পাইবে, সেই যন্ত্রের ক্ষমতার মূলে পাথুরে কয়লা। ইহার জন্ম-কথা জানিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর শৈশবে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। সবে মাত্র তখন পৃথিবীতে স্থানে স্থানে মাটী দেখা দিতেছে। তখন পৃথিবী সমতল বলিয়া বৃষ্টির জল যেখানেই পড়িত, সেইখানেই বদ্ধ হইয়া জলাভূমির সৃষ্টি করিত। এই সকল জলায় তখন এক প্রকার বৃহদাকার অল্পায়ু বৃক্ষ জন্মিত।

আজকালকার জীব জন্তু ত জন্মে নাই ; আজকালকার গাছপালাও তখন জন্মিত না। তখন জন্মিত মাত্র একপ্রকার কোমল উদ্ভিদ ; তাহারা যত শীঘ্র বাড়িত আবার ততোধিক শীঘ্রই ঝরিয়া পড়িত। তখন চারিদিকেই জলাভূমি।

প্রতি বৎসর এই গাছগুলি হইতে পাতা ঝরিয়া, গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই জলায় জমা হইত। আবার নূতন গাছ জন্মিয়া নূতন বনের সৃষ্টি করিত। এই-রূপে ঝরা পাতা ও ভাঙ্গা গাছ জড় হইয়া ক্রমশঃ একটী কালো স্তরের সৃষ্টি করিত। এইরূপ স্তর পৃথিবীর বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্দেশবাসীরা এই স্তর কাটিয়া লইয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে।

তাহার পরে কালে এই স্তর কোনও ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক কোন বিপ্লবে মাটী চাপা পড়িল। আবার সেই মাটীর উপর বৃষ্টি পড়িয়া জলার সৃষ্টি হইল; আবার পূর্ব্বের মত বন জন্মিল। তাহাদের ঝরা পাতা ও ভাঙ্গা ডাল স্তূপীকৃত হইয়া অপর এক নূতন স্তরের সৃষ্টি করিল। এইরূপ যুগে যুগে হয়ত ভূমিকম্পের
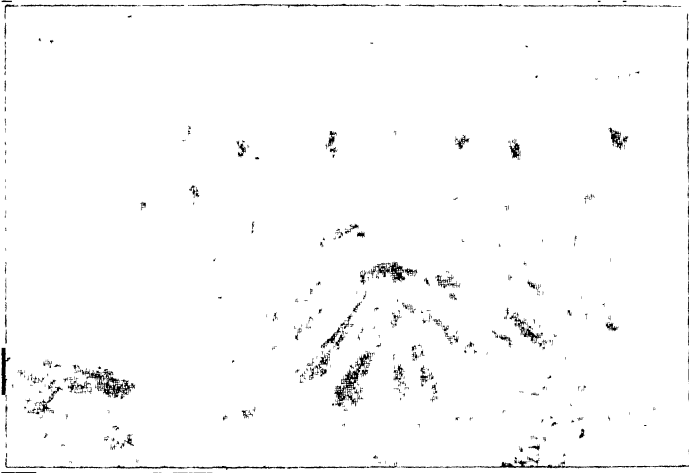
গাছ জমিয়া কয়লা হইয়াছে।

মত কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে মাটী, বালি, পাথর চাপা পড়িয়া নূতন নূতন স্তরের সৃষ্টি করিত। নূতন স্তরগুলির চাপে নীচেকার মৃত উদ্ভিদ স্তরগুলি কালে এক রসহীন কঠিন পদার্থের স্তরে পরিণত হইল। বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কৃষ্ণবর্ণ মৃত উদ্ভিদের স্তরগুলিকে আমরা আজকাল কয়লা বলি।

সেইজন্য মাটী খুঁড়িয়া মানুষ যুগযুগান্তরের কথা জানিতে পারে। কোথাও বালির স্তর পাইলে স্বতঃই মনে হয় কোন যুগে এই স্তরের উপরে হয়ত সমুদ্র ছিল বা কোন নদী প্রবাহিত হইত। তাহার পর প্রকৃতির খেয়ালে সমুদ্র সরিয়া গিয়া-

ছিল বা নদী অন্য কোন পথ লইয়াছিল। কোনও স্তরে সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাইলে এক কালে ঐ স্তর যে সমুদ্র গর্ভে ছিল তাহার কথা বলিয়া দেয়। এই সকল কারণে কয়লার খনিতে কয়লা নানা স্তরে পাওয়া যায়।

কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ (Explosion) হয় কেন ?

কোন কোন খনিতে বহুল পরিমাণে গ্যাস কয়লার স্তরের ফাঁকে ফাঁকে উপরিস্থিত মাটির বিষম চাপে ঘন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এই গ্যাস অতিশয় দাহ্য পদার্থ। সাধারণতঃ এই গ্যাস খনির বায়ু চলাচল পথে নির্ব্বিঘ্নে পথ পাইয়া বাহির হইয়া যায়। কোথাও কোথাও এই গ্যাস বাহির হইবার পথ না পাওয়ায় খনির ফাটালে ফাটালে থাকিয়া যায়। তাহার পর মজুরদের আলোর অনাবৃত শিখা ঐরূপ সঞ্চিত গ্যাসরাশির নিকট আনিলে, একটা ভীষণ শব্দ করিয়া এই বহুযুগ সঞ্চিত গ্যাস জ্বলিয়া উঠে।

কোথাও আবার খনিগর্ভে কয়লা কাটিবার সময় কয়লার ধূলিরাশি উড়িয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহার নিকটে আলোকশিখা আনিলেও পূর্ব্বের মত সশব্দে জ্বলিয়া উঠিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে।

বিস্ফোরক পদার্থ এত শক্তিশালী কেন ?

বিস্ফোরক পদার্থ অক্সিজন ঘটিত কোন পাদার্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণে গঠিত। ইহাতে আগুন ধরাইলে অক্সিজন ঘটিত দ্রব্য হইতে অক্সিজন বাহির হইয়া আসে এবং মিশ্রিত দ্রব্যের অন্য কোন গ্যাসের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে নূতন নূতন গ্যাসের জন্ম হয়। এই নূতন গ্যাসগুলি আগুনের তাপে অত্যধিক ফাঁপিয়া অল্প পরিসর স্থানে নিজের স্বাভাবিক স্থান করিবার জন্য অসম্ভব শক্তি প্রকাশ করে।

এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া গোলাগুলি দূরে নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হয় এবং পাথর ফাটাইয়া পথ প্রস্তুত প্রভৃতি নানাকার্য্য উদ্ধার করা হয়।

কয়লা পোড়াইলে সামান্য ছাইমাত্র পড়িয়া থাকে কেন ?

সাধারণ কয়লায় থাকে হাইড্রোজন ও নাইট্রোজন নামে দুই প্রকার গ্যাস, অধিকাংশ অঙ্গার এবং সামান্য মাটি ও বালি। কয়লা পুড়িলেই অঙ্গার বায়ুর অক্সিজন গ্যাসের সঙ্গে মিলিয়া কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ (carbon-oxide) বলিয়া একটী নুতন গ্যাস হইয়া চিমনী দিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। কয়লার বায়বীয় অংশের হাইড্রোজন্ জ্বলিয়া এবং নাইট্রোজন স্বাভাবিক অবস্থায় চিমনী দিয়া উপরে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। চুল্লীতে পড়িয়া থাকে মাত্র পোড়া মাটি' ও বালি। এই অবশিষ্ট পোড়া অংশটুকুকে আমরা ছাই বলি।

অঙ্গারের বিভিন্ন রূপ

(১) হীরক কি ?

বিশুদ্ধ অঙ্গার অসম্ভব চাপ ও তাপের ফলে স্বচ্ছ দানাদার রূপ ধারণ করে। লোকে ইহাকে হীরক বলে। হীরক অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র।

(২) পেন্সিলের লেড্ কি ?

লেড্ মানে সীসা তোমরা জান। কিন্তু লেড্ পেন্সিলের লেড্টী সীসায় তৈয়ারী হয় না। গ্রাফাইট্ নামে এক প্রকার অতি বিশুদ্ধ অঙ্গার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। গ্রাফাইট্ (Graphite) খনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে অতি মিহি করিয়া পিশিয়া কাদার সহিত মাখা হয়। কাদার পরিমাণ বেশী থাকিলে নরম (soft) লেড্ হয় এবং কাদার পরিমাণ কম হইলে শক্ত (hard) লেড্ হয়।

এইরূপ মাখা হইলে যন্ত্রের সাহায্যে গোল কিংবা চারিকোনা সরু কাঠির মত করা হয়। এই কাঠিগুলি মাপ করিয়া কাটিয়া শুখান হয়। তাহার পর এই কাঠিগুলিকে চুল্লীতে সেঁকিয়া লইলেই শক্ত হয়। এই গ্রাফাইটের কাঠি কাঠের খোলে আঁটিয়া দিলেই পেন্সিল তৈয়ারী হয়।

জ্বালানি (২)
কেরাসিন তৈল

কেরাসিন তৈলের আলোয় চিম্‌নি ব্যবহার করা হয় কেন ?

আলোতে দুটি উদ্দেশ্যে চিমনী ব্যবহার করা হয়।

(ক) যাহাতে বাহিরের জোর বাতাসে আলো না নিভিয়া যায়।

(খ) আলোর তাপে চিমনীর বায়ু ফুলিয়া উপরে উঠিয়া গেলে তাজা বাতাস চিমনীর তলার টিনের চাকৃতির অসংখ্য ফুটা দিয়া আসিয়া প্রচুর পরিমাণে যোগান দেওয়ায় তেলের অঙ্গার ভাল করিয়া জ্বলিতে পায়। ফলে কম তেলে বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায় এবং আলোর শিষ উঠিয়া চিমনীতে কালি পড়িয়া আলো ঢাকিয়া অন্ধকার করিয়া তুলিতে পারে না।

পল্‌তে বেশী তুলিয়া দিলে আলোয় শিষ পড়ে কেন ?

বাতির পলতে বেশী তুলিয়া দিলে খুব বেশী পরিমাণে তেল উঠিতে থাকে। কিন্তু অত তেল ভাল করিয়া জ্বালাইবার যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল হইতে যোগান হয় না বলিয়া তেলের সমস্ত অঙ্গার না পুড়িয়া বহু পরিমাণে পড়িয়া থাকে। এই বাকী অঙ্গারটুকুকে শিষ বলে।

তেল শীঘ্র জ্বলে কেন ?

তৈলে হাইড্রোজেন্ ও কার্ব্বন নামে দুইটী খুব দাহ্য পদার্থ খুব বেশী পরিমাণে আছে। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে দুটীই খুব শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে বলিয়া তেল এত শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে।

গাঢ় তেল অপেক্ষা পাতলা তেল শীঘ্র জ্বলে কেন ?

গাঢ় তেল অপেক্ষা পাতলা তেলে খুব বেশী পরিমাণে হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন জ্বলিবার মত অবস্থায় থাকে সেইজন্য পাতলা তেলে শীঘ্র আগুন ধরে; এবং গাঢ় তেলে আবর্জ্জনা অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া শীঘ্র জ্বলিতে পারে না।

কাঠের খুঁটি মাটিতে পুঁতিবার অংশ একটু পোড়াইয়া লওয়া হয় কেন ?

কাঠ সামান্য পোড়াইয়া উপরের অংশটুকু অঙ্গার করিয়া লইলে পোকা বা জল উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। তাহা না হইলে মাটিতে পোঁতা অংশটুকু পচিয়া গিয়া খুঁটিটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

শব্দ

আমরা শব্দ শুনিতে পাই কেন ?

বায়ুমণ্ডলে কোন জিনিসের সাহায্যে ঢেউ তুলিতে পারিলেই, সেই ঢেউ যখন আমাদের কানের পর্দায় আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন আমরা শব্দ শুনিতে পাই। ঢেউএর বড় ছোটর হিসাবে শব্দ বেশী বা কম হইয়া থাকে।

পূর্ণকুম্ভ অপেক্ষা শূন্য কুম্ভে আঘাত করিলে বেশী শব্দ হয় কেন ?

কোন জিনিসে আঘাত করিলে, সেটী কাঁপিতে থাকে। এই কাঁপুনির ফলে বায়ুমণ্ডলে ঢেউ উঠে। আঘাতে পূর্ণকুম্ভ ভারী বলিয়া কম কাঁপে কিন্তু শূন্যকুম্ভ হাল্কা বলিয়া বেশী কাঁপে ; তাই বড় বড় ঢেউ উঠে এবং শব্দও বেশী হয়।

কোন চোংএ মুখ দিয়া কথা কহিলে বহুদূর পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় কেন ?

বায়ুমণ্ডলে ঢেউ তুলিতে পারিলে তবে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে ঢেউ তুলিয়া কোন লাভ নাই বরং বৃথা শক্তি নষ্ট হয়। যাহাকে তোমার কথা শুনাইতে চাও, সেই দিকে মাত্র ঢেউ তুলিতে পারিলে অল্প পরিশ্রমেই অধিক কাজ পাওয়া যায়। চোংএ মুখ দিয়া কথা কহিলে একই দিকে ঢেউ উঠে এবং তোমার সকল ক্ষমতাটুকু সেই একই দিকে ঢেউ তুলিতে নিয়োজিত করায় বহুদূর পর্য্যন্ত ঢেউগুলি ছুটিতে পারিয়া বহুদূর শব্দ পৌছাইয়া দেয়।

প্রতিধ্বনি হয় কেন ?

পাহাড়ের কোলে, কোন উচ্চ প্রাচীরের সম্মুখে বা কোন বড় হল ঘরে জোরে কথা কহিলে কথিত বাক্যগুলি পুনরায় শুনা যায়। বায়ুতে তরঙ্গ উঠিয়া তাহা আমাদের কানের পর্দ্দায় ধাক্কা দিলে তবে আমরা শুনিতে পাই। উল্লিখিত ক্ষেত্রে শব্দের তরঙ্গ পর্ব্বতাদির গাত্রে ঠেকিয়া ফিরিয়া কানের পর্দ্দায় আবার পূর্ব্বের মত ধাক্কা দেয় বলিয়া আমরা কথিত বাক্যের অনুরূপ শব্দ পুনরায় শুনিতে পাই।

বোতলের জল ঢালিলে ভক্ ভক্ শব্দ হয় কেন ?

বোতলের জল খানিক বাহির হইয়া গেলে বোতলের ভিতরের বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম হইয়া পড়ে। তখন বাহিরের বায়ু ভিতরে ঢুকিবার পথ পায় এবং জল পড়া একটু কম হয়। বাতাস ঢুকিবার ফলে বোতলের বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপ আবার সমান হইলে আবার জল পড়িতে আরম্ভ হয়। এইরূপ মাঝে মাঝে জল পড়া কম হয় ও হাওয়া ঢোকে; আবার খানিকটা হাওয়া ঢুকিবার পর পূর্ব্বের মত জল পড়িতে থাকে।

এইরকম মাঝে মাঝে বোতলের মধ্যে বায়ু ঢোকায় একটা ভক্ ভক্ শব্দ হয়।

জোরে শব্দ হইলে ঘরের সার্সি ভাঙ্গিয়া যায় কেন ?

বোমা ফাটায় বা বড় বড় কামান দাগায় বায়ু মণ্ডলে খুব বড় বড় ঢেউয়ের

সৃষ্টি হয়, সেই জন্য ভীষণ শব্দ হয়। এই বড় বড় ঢেউগুলি ভীষণ বেগে আসিয়া চারি পাশের জিনিষে ধাক্কা দেয়। সাসি এই ভীষণ ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গোলোন্দাজেরা বড় বড় কামান দাগিবার সময় কানে ঠুলি ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থা না করিলে কানের কোমল পর্দ্দায় ভীষণ ধাক্কা লাগিয়া পর্দ্দা ফাটিয়া গিয়া গোলোন্দাজ জন্মের মত কালা হইয়া যাইতে পারে।
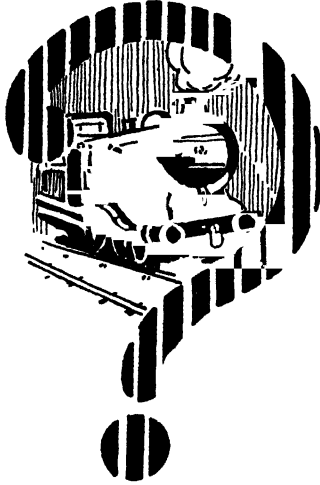
ইঞ্জিন চলিলে একটা ভস্ ভস্ শব্দ হয় কেন ?

পিষ্টনের প্রত্যেক আঘাতের শেষে খানিকটা বাষ্প হঠাৎ সিলিণ্ডার হইতে মুক্তি পাইয়া অতিবেগে আকাশে মিশিয়া যায়; ফলে বায়ুমণ্ডলে বড় বড় ঢেউ উঠে। ইহাতে ভস্ ভস্ আওয়াজের সৃষ্টি হয়। যখন কোন ট্রেন ষ্টেশন ছাড়ে তখন শব্দ বেশী হয় কারণ প্রথম গাড়ীগুলি চলন্ত করিবার সময় অধিক বাষ্পের চাপ দরকার হয়, সেই জন্য ট্রেন ছাড়িবার মুখে খুব বেশী ভস্ ভস্ শব্দ হয়।

আলোক

বিড়াল অন্ধকারে দেখিতে পায় কেন ?

বিড়ালের চোখের তারা গোল। এই তারার মধ্য দিয়া বাহিরে দৃশ্যের ছবি মাথায় গিয়া পৌঁছিয়া সেই জিনিষটীর ধারণা জন্মায়। দিনে প্রচুর আলো থাকে বলিয়া তারাটী সামান্য একটী রেখার মত আকার গ্রহণ করে। ইহাতেই ইহার দেখা চলে। কিন্তু রাত্রে আলো খুব কম থাকায় আলো সংগ্রহের শক্তি বাড়াইবার জন্য তারাটী বড় ও গোলাকার হয়; সেই জন্য রাত্রেও অতি অল্প আলোয় বিড়ালের দেখিবার কোন অসুবিধা হয় না।
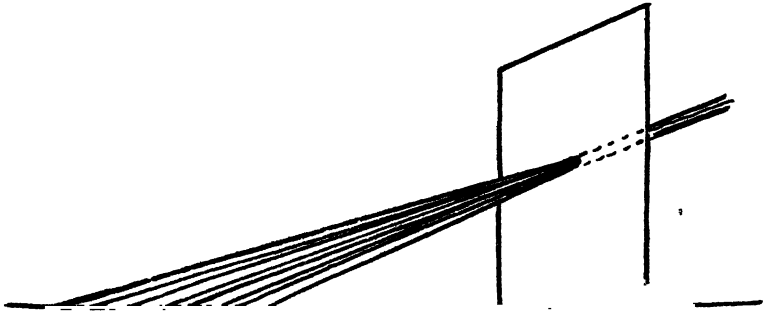
জানালার কোন ছোট ফুটা দিয়া সূর্য্যের আলো ঘরের মধ্যে আসিলে যে পথে সূর্য্যের আলো আসে সেটি দেখিতে পাওয়া যায় কেন ?

ঘরের বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য ধূলিকণা ভাসিতে থাকে। আসিবার পথে ধূলিকণারাশির উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া সেই ধূলিকণাগুলিকে আলোকিত করিয়া তুলে। সেইজন্য আমরা আলো আসিবার পথে আলো দেখিতে পাই। ঘরের বায়ুমণ্ডলে যদি ধূলিকণা বা বাষ্প না থাকিত, তাহা হইলে আলো আসিবার পথে আলো দেখিতে পাওয়া যাইত না।

ত্রিশিরা কাঁচের উপর সূর্য্যের সাদা আলো পড়িয়া বাহির হইয়া আসিলে নানা বর্ণযুক্ত দেখায় কেন ?

সূর্য্যের আলো নানা বর্ণের আলোক মিলিয়া সাদা হইয়াছে। ত্রিশিরা কাঁচের মধ্য দিয়া সাদা আলো বাহিরে আসিলে যে বর্ণালীর (**Spectrum**) সৃষ্টি করে তাহাতে মোটামুটিভাবে বেগুণি (Indigo) নীলি (Violet) নীল (Blue) সবুজ (Green) পীত (Yellow) কমলা (Orange) ও লাল (Red) এই সাতটী বর্ণ চোখে পড়ে। এই সাতটী রংয়ের সমাবেশে সাদা রংএর সৃষ্টি হইয়াছে ; আবার এই সাদা রংকে যদি ত্রিশিরা কাঁচের

(prism) মত কোন মাধ্যমের (Medium) মধ্য দিয়া আমা হয় তাহা হইলে সাদা রংটি উক্ত সাতটী রংএ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটী বর্ণালীর সৃষ্টি করে।

নানা রংএর অনুভব হয় কেন?

সূর্য্যের আলো কোন জিনিষের উপর পড়িয়া, ঠিকরাইয়া সেই আলো আমাদের চোখে পৌছিলে আমরা সেই জিনিষটী দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলোয় সকল রংই বর্ত্তমান। ধর কোন জিনিষ সবুজ দেখিতে; ইহার কারণ সূর্য্যের কিরণ জিনিষটীর উপর পড়িলে সেই জিনিষটী সূর্য্যের আলোর কেবলমাত্র সবুজ অংশটী ফিরাইয়া দেয়। বাকী রংগুলি বেমালুম শুষিয়া লয়; সেই জন্য আমরা সেই দ্রব্যটী সবুজ দেখি। এইরূপ সকল রংএর বেলাতেই ঘটিয়া থাকে।

অন্ধকার নামিয়া আসলে সর্ব্বাপেক্ষা শেষ পর্য্যন্ত সাদা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

সাদা জিনিষের উপর সূর্য্যের আলো পড়িলে সকল অংশই ফিরাইয়া দেয় বলিয়া সেই জিনিষটি সাদা দেখায়।

কাল জিনিষের বেলায় সূর্য্যের সকল রংগুলিই শুষিয়া লয় বলিয়া আলোর কোন অংশই ঠিকরাইয়া ফিরত আসে না। ফলে আমরা সেই জিনিষটী রংশূন্য বা কাল দেখি।

রঙ্গিন জিনিষ সূর্য্যের আংশিক আলো ফেরত দেয় বলিয়া আঁধার নামিয়া আসিলে, অল্প আলোর আংশিক মাত্র ফেরত আসায় সেইগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে। কিন্তু সাদা জিনিষ সূর্য্যের আলোর সবটাই ফেরত পাঠায় বলিয়া আঁধার নামিয়া আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা শেষ পর্য্যন্ত সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

আতশী কাঁচের মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া কোন জিনিষে পড়িলে সেইটি জ্বলিয়া উঠে কেন ?
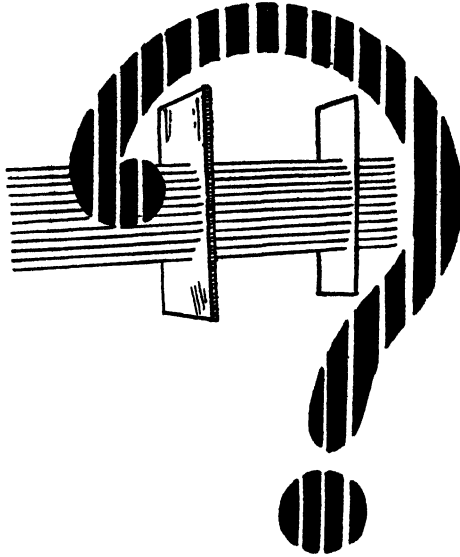
১নং চিত্র

সাধারণ কাঁচের মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলো আসিলে যেমন ভাবে আসে ঠিক সেইরূপ সোজাভাবেই বাহির হইয়া আসে (১নং চিত্র)।
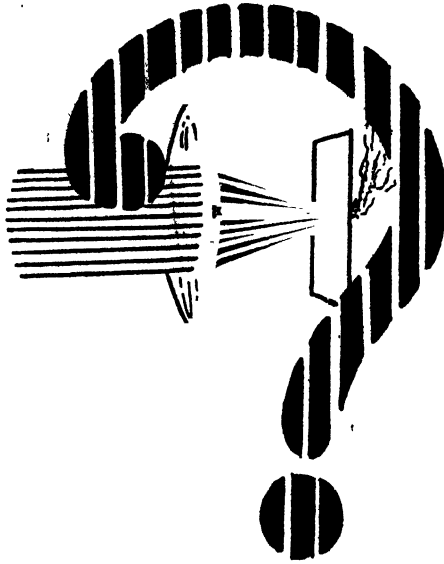
২নং চিত্র

কিন্তু আতসী কাঁচের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মিগুলি আসিবার সময় সবগুলি জড় হইয়া একটি বিন্দুতে আসিয়া পড়ে ; ফলে সেই বিন্দুতে আলোর তেজ শতগুণ বাড়িয়া যায়। তাই আগুন ধরিয়া যায়। (২নং চিত্র)

একটি লাঠির কতক অংশ জলে ডুবাইয়া রাখিলে লাঠিটি বাঁকা দেখায় কেন ?

সূর্য্য হইতে আলোক আসিবার সময় মহাকাশে এক প্রকারের তরঙ্গ উঠে। সেই তরঙ্গের কম্পন আমাদের চক্ষে আসিয়া আলোর অনুভূতি জন্মায়। মহাকাশ সূর্য্য হইতে উদ্ভূত এক প্রকার তরঙ্গের মাধ্যম (Medium) মাত্র। একই মাধ্যমে যখন তরঙ্গ উঠিতে থাকে, তখন সেই তরঙ্গগুলি সরল রেখায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ তরঙ্গগুলি এক মাধ্যমে উঠিতে উঠিতে আর এক

নূতন মাধ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে বাহন পরিবর্ত্তনের মুখে তাহার গতিপথের পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাই হইল তরঙ্গের সাধারণ ধর্ম্ম।

এই কারণে আলোক তরঙ্গ মহাকাশে উঠিতে উঠিতে, হঠাৎ জলের মধ্যে প্রবেশ করিলে বাহন পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার গতিপথ বাঁকিয়া যায়; সেই জন্য জলে লাঠিটি জল ও আকাশের মিলন মুখে বাঁকা দেখায়।

ইহাকে আলোকের প্রতিসরণ (Refraction) বলে।

পরিস্কার পুষ্করিণীর তলদেশ দেখিতে পাইলে, প্রকৃত গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?

আলোক প্রতিসরণের ফলে তলদেশ একটু অল্প গভীর দেখায়। যদি উপর হইতে ৬ হাত গভীর দেখায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা প্রকৃত ৮ হাত গভীর।

এইরূপে উপর হইতে অল্প গভীর আন্দাজ করিয়া জলে নামিয়া পড়িলে অনেক সময়ে বিপদে পড়িতে হয়।

এক্স-রে (X-Ray) কি ?

জার্ম্মানীর অধ্যাপক উল্‌হেল্‌ম্ কনার্ড রণ্টজেন্ এই কিরণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সাধারণ সূর্য্যের কিরণ যে পদার্থে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসে, পার হইতে পারে না; সেইরূপ পদার্থও এক্স্‌রে (X-Ray) ভেদ করিতে পারে। সাধারণ সূর্য্যের আলো আমাদের দেহ ভেদ করিতে পারে না। X-Ray আমাদের দেহের হাড় ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু মাংস ভেদ করিতে পারে; ফলে দেহের ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড়ের আলোকচিত্র খুব সহজেই লইতে পারা যায়।

কস্‌মিক্-রে (Cosmic Ray) কি ?

দূর মহাকাশের গর্ভ হইতে এই প্রকার কিরণ আসে, এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি।

আমরা এতদিন X-Rayকেই অতি শক্তিশালী কিরণ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু X-Ray সীসার অতি পাতলা পাতও ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু Cosmic Ray এতই শক্তিশালী, যে ১৬ ফুট পুরু সীসার পাতও অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

আকাশ নীলবর্ণ কেন ?

নির্ম্মল আকাশের দিকে দেখিলে যে অতুলনীয় নীলবর্ণের সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে, তাহা কোথা হইতে আসে ? এতদিন লোকের ধারণা ছিল যে বায়ুমণ্ডলে যে অসংখ্য ধূলিকণা ভাসে, তাহাতে স্র্য্যের আলো পড়িয়া ঐ অতুলনীয় নীলবর্ণের স্থষ্টি করে। ঐ ধারণা যে ভুল, তাহা আজকাল পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে।

অধ্যাপক ভিগার্দ বহু পরীক্ষার পর আবিষ্কার করেন যে প্রায় ৪০ মাইল উর্দ্ধে অতি শীতল বায়ুস্তরে বায়ুর নাইট্রোজেন গ্যাস জমিয়া অতি ক্ষুদ্র নাইট্রোজেন্ দানারূপে ভাসিয়া আছে। এই অসংখ্য ভাসমান নাইট্রোজেন দানাগুলি আমাদের পৃথিবীর প্রায় ৪০ মাইল উপরে আকাশের গায়ে একখানি চাঁদোয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে প্রথম নাইট্রোজেন চাঁদোয়া (First heaviside layer) নাম দিয়াছেন। ইহাকে রেডিওমণ্ডলও বলা চলে। প্রায় ১০০ মাইল উর্দ্ধে আর একটি ঠিক ঐরূপ চাঁদোয়ার অস্তিত্ব সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। ইহাকে দ্বিতীয় নাইট্রোজেন চাঁদোয়া (Second heaviside layer) বলিতে পারা যায়।

নাইট্রোজেন বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া উহা শীতে জমিয়া দানা বাঁধিলেও নীচে পড়িয়া যায় না। এই নাট্রোজেন দানার চাঁদোয়ায় স্র্য্যের আলো পৌছিলে চাঁদোয়ার নাইট্রোজেন দানাগুলি ত্রিশিরা কাঁচের (Prism) মত স্র্য্যের রশ্মিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্র্য্যের ভাঙ্গা রশ্মির বর্ণালীর নীল ভাগ পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হওয়ায় সারা আকাশ নীলবর্ণ দেখায়।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ চমকাইলে খুব জোরে শব্দ হয় কেন ?

বিদ্যুতের তাপে তাহার আশপাশের বাতাস তাতিয়া হঠাৎ খুব বেশী ফাঁপিয়া উঠে ; আবার তৎক্ষণাৎ চারিদিকের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এইরূপ হঠাৎ জোরে ফাঁপায় ও কোঁচকানোয় বায়ুমণ্ডলে খুব বড় বড় ঢেউএর সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এত জোরে শব্দ হয়।

বিদ্যুৎ চমকাইলে আলো দেখিবার অনেক পরে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কেন ?

আকাশে শব্দ ও আলোর সৃষ্টি একই সময় হইলেও আমরা আলো দেখিবার বহু পরে শব্দ শুনিতে পাই। আলো এক সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল ছুটে। কিন্তু শব্দ এক সেকেণ্ডে মাত্র ১১২০ ফুট ছুটিয়া থাকে। ধর ১১২০০ ফুট (প্রায় দুই মাইল) উপরে যদি এইরূপ ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে সেখান হইতে শব্দ কানে পৌছিতে লাগিবে ১০ সেকেণ্ড, কিন্তু আলো নিমিষে আসিয়া চোখে উপস্থিত হইবে। কাজেই কানে শব্দ পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই চোখে আলো আসিয়া উপস্থিত হয়।

আকাশে মেঘ ঘন ঘন ছুটাছুটি করিলে বিদ্যুৎ চমকায় কেন ?

আকাশে স্তরে স্তরে মেঘখণ্ডে বিদ্যুৎ পূর্ণ থাকে। বাতাসের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে একটী মেঘখণ্ড যখন আর একটী মেঘখণ্ডের নিকট আসে, তখন যে মেঘখণ্ডে বেশী চাপের বিদ্যুৎ থাকে তাহা হইতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎটুকু লাফাইয়া অন্য মেঘখণ্ডে মিশিয়া উভয় মেঘখণ্ডের বিদ্যুতের

চাপের পরিমাণ সমান করিয়া দেয়। এইরূপ লাফাইবার সময় মেঘখণ্ড দুটীর মাঝখানের শূন্য আকাশে আলোর ফিন্‌কি (Spark) দেখা দেয়, তাহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বলি।
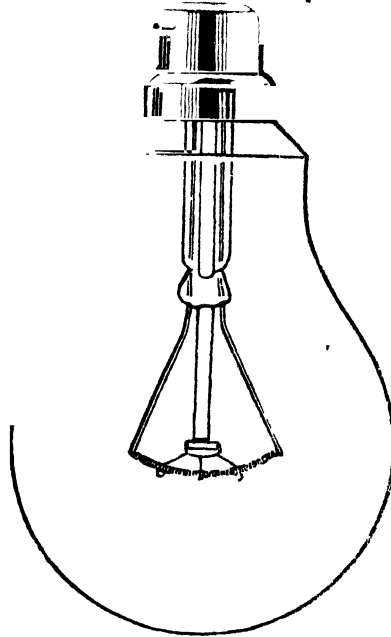
বিজলী বাতির উপর একটি কাঁচের বায়ুশূন্য খোল ব্যবহার করা হয় কেন ?

[illegible] বাতির বায়ুশূন্য খোলটিকে বাল্ব (Bulb) বলে। এই বাল্ব আঁটিবার সময় ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব বায়ু টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার পরে বাল্বের মুখ জুড়িয়া দেওয়া হয়। বাল্বের ভিতর থাকে মাত্র অতি তাপসহ ধাতুর অতিশয় সরু তার। বিজলীর স্রোত ইলেক্‌ট্রিক

লাইনের চওড়া পথে আসিয়া বাল্বে ঢুকিয়া অতি সরু পথে চলে বলিয়া ঘর্ষণে তাতিয়া উঠে। এই তাপে সরু তারগুলিও তাতিয়া খুব লাল হইয়া উঠে বলিয়া আমরা আলো পাই। সরু তারের উপরে কাঁচের আবরণ না থাকিলে—

(ক) অতিশয় তপ্ত সরু তারগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিবামাত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

(খ) সরু তার অন্য জিনিষে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

বাড়ীর সুইচ বোর্ডে ফিউজ বা ইলেক্‌ট্রিক লাইনে কাট আউট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে কেন ?

কোন কারণে তড়িতের (Current) স্রোতের চাপ বাড়িলে তামার তার তাতিয়া পুড়িয়া সমস্ত লাইন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ফিউজ বা কাট্ আউটের ব্যবস্থা থাকিলে তাত বাড়িবামাত্র অল্প তাপসহ ফিউজ গলিয়া যায়, ফলে তড়িতের স্রোত যাইবার আর পথ না পাইয়া আলো নিভিয়া যায়; এবং লাইনের কোন ক্ষতি হয় না বা লাইন পুড়িয়া বাড়ীতে আগুন ধরিবারও ভয় থাকে না।

বাদলার দিনে ঘুড়ি উড়ান বিপজ্জনক কেন ?

শুকনো সূতা বহিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না; কিন্তু সূতা ভিজিলে উহা বিদ্যুৎবাহী (Conductor) হয়। ছুটন্ত মেঘ বিদ্যুৎ পূর্ণ থাকে। বৃষ্টির জলে সূতা ভিজিয়া গেলে বিদ্যুৎবাহী হইয়া উঠে। এদিকে ঘুড়িখানি বাদলার দিনে মেঘের মধ্যে উড়িতে থাকায় মেঘের বিদ্যুৎ ভিজা সূতা বহিয়া নীচে নামিয়া আসিবার পথ পায়; এই অবস্থায় কেহ সূতা ছুঁইলেই ভীষণ ধাক্কা (shock) খাইয়া মাটীতে পড়িয়া যাওয়া সম্ভব। ঘুড়ির

নিকটস্থ মেঘে অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ থাকিলে এইরূপ ধাক্কায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

ঠিক এই কারণেই বাদলার দিনে ঘুড়ির ভিজা সূতা যদি কোন বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলেও লোকে একটা ধাক্কা খায়। এরূপ বিপদের কথা আজকাল খবরের কাগজে প্রায় দেখা যায়।

ট্রামের ইলেক্ট্রিক লাইন সারিবার সময় বিজলীর ধাক্কা লাগে না কেন ?

কাঠের মাচানের (Platform) উপর দাঁড়াইয়া লোকে লাইন সারে। কাঠ বিজলীর অতি মন্দ বাহন। ইহার মধ্য দিয়া বিজলী যাইতেই পারে না। সেই জন্য বিজলীবাহন তার হাত দিয়া স্পর্শ করিলেও ধাক্কা লাগে না, কেননা তারের বিজলী দেহ হইয়া কাঠের মাচানের মধ্য দিয়া মাটিতে গিয়া মিশিবার পথ পায় না।

উঁচু বাড়ী, চিমনী ইত্যাদি বড় বড় ইমারতে তামার তার লাগাইয়া মাটির সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় কেন ?

বজ্রপাত হইলে নিকটস্থ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বাড়ীতেই গিয়া পড়ে। উল্লিখিত ব্যবস্থা থাকিলে বজ্রের বিষম শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ উক্ত তামার

তার বহিয়া নামিয়া মাটীতে চলিয়া যায়; বাড়ীর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। তাহা না হইলে, বাড়ীতে বজ্রপাত হইলে, তাহার ভীষণ ধাক্কায় বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে।

এইজন্যই ঝড়-বাদলার দিনে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া নিরাপদ নহে। নিকটে বজ্রপাত হইলে আগে গাছেই পড়িবে। ফলে যে গাছের নীচে থাকিবে তাহার বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

ছুঁচ্ বা পিনের মত ছোট লোহার জিনিষ ছড়াইয়া গেলে সহজে কি করিয়া জড় করা যায় ?

একটী চুম্বকের আকর্ষণে ছড়ান পিনগুলি একত্র করা খুব সহজ।

বিজলীবাহী তারে পাখী বসিলে বিজলীর ধাক্কায় মারা যায় না কেন ?

বিজলীবাহী তার এবং তাহার স্তম্ভগুলির মাঝে বিজলীরোধক (non-conductor) পদার্থ দেওয়া থাকে। ফলে তারের বিজলী মাটীতে যাইতে পারে না। সেইজন্য কোন পাখী যদি তারে বসে তাহা হইলে বিজলী পাখীর দেহের মধ্য দিয়া যাইতে পাইলেও মাটীর মধ্যে যাইবার পথ পায় না, ফলে পাখীকেও ধাক্কা (shock) লাগে না। কিন্তু কোন প্রকারে যদি মাটীর সহিত বিজলী-বাহনের যোগাযোগ ঘটে তাহা হইলে তারের বিজলী পাখীর দেহের মধ্য দিয়া মাটীতে আসিবামাত্র বিজলীর ধাক্কায় (shock) পাখীটী মারা পড়িবে।

বিজলীর সাহায্যে কলাই কিরূপে করা হয় ?

মনে কর কোন একটী পদার্থে (ক) রূপার কলাই করিতে হইবে। এই পদার্থটীকে রূপার পানা (Chemical Sol. of Silver) পূর্ণ একটী পাত্রে ঝুলাইয়া রাখ, এবং ব্যাটারীর নেগেটিভ পোলের (Negative pole) সহিত

সংযোগ করিয়া দাও। উক্ত পানা পূর্ণ পাত্রে আর একটী বিশুদ্ধ রূপার পাত (খ) ঝুলাইয়া দাও এবং ব্যাটারীর পজিটিভ্ পোলের (Positive pole) সহিত যুক্ত কর। বিজলী প্রবাহ ব্যাটারী হইতে বাহির হইয়া রূপার পাতের মধ্য দিয়া
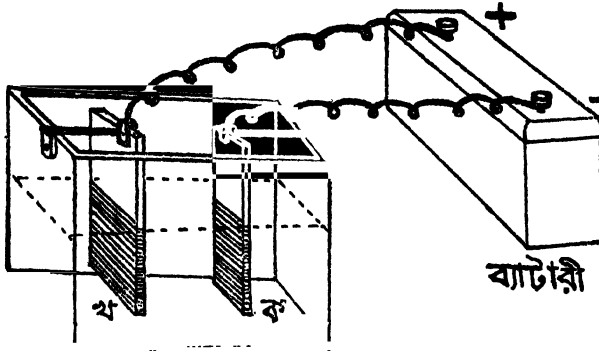
রূপার পানা-পূর্ণ পাত্র

গিয়া, রূপার পানার মধ্য হইয়া পদার্থটির মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আবার ব্যাটারীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই বিজলী প্রবাহের ফলে (ক) পদার্থে রূপার কলাই ধরিবে এবং (খ) রূপার পাত হইতে সম পরিমাণ রূপার অণু বাহির হইয়া পানায় মিলিয়া পানার ঘনত্ব ঠিক রাখিবে।

ইহাকেই ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বা রূপার কলাই করা বলে।

মেরুপ্রভার রহস্য কি ?

সময়ে সময়ে দুইটি মেরুপ্রদেশেই এক অতি আশ্চর্য্য আলোক ছটা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রূপের তুলনা নাই। ইহা কখন সবুজ, কখন লাল আবার কখন পীত বর্ণচ্ছটায় মেরুপ্রান্ত আলোকিত করিয়া তুলে। কখন বা শান্ত একটানা সাদা অত্যুজ্জ্বল আলোকে প্রাণ মন জুড়াইয়া দেয়। ইহা নানা স্থানে নানারূপে ফুটিয়া উঠিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুষমার সৃষ্টি করে। ইহাকে আমরা মেরুপ্রভা

বলিয়া থাকি। এত দিন এই আলোক ছটা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি অস্‌লো (Oslo) নিবাসী অধ্যাপক ভিগার্দ ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মেরুপ্রভা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়;

(১) মেরুপ্রভার বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) একটি বিশেষ সবুজ রেখা আছে।

(২) উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ ব্যতীত ইহার প্রকাশ আর কোথাও লক্ষ্য হয় না।

(৩) মেরুপ্রভার জন্ম পৃথিবী হইতে বহু উর্দ্ধে ঘটিয়া থাকে।

(৪) মেরুপ্রভার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত

(ক) সৌরকলঙ্ক (Sunspot) সংখ্যার এবং

(খ) দিগ্দর্শন যন্ত্রের চুম্বন শলাকার (Magnetic needle) কম্পনের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

অধ্যাপক ভিগার্দ প্রথমে একটি বদ্ধ পাত্রে নাইট্রোজেন গ্যাসকে অতিরিক্ত শৈত্যের সাহায্যে জমাইয়া দানা বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নাইট্রোজেনের ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দানাগুলিকে প্রচণ্ড বেগবান বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। উক্ত আঘাতের ফলে ঐ দানাগুলি হইতে যে রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল তাহা বর্ণচ্ছত্রমান (Spectro Scope) যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, যে মেরুপ্রভার বর্ণচ্ছত্রে প্রাপ্ত উজ্জ্বল সবুজ রেখার ন্যায়, উহাতেও আলোক রেখা আছে।

এইবারে মেরুপ্রভার জন্মকথা বুঝিতে পারা সহজ হইবে। কোন কারণে সৌরজগতে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিলে সৌরগাত্রে বিরাট ক্ষতের মত কলঙ্ক আমরা দেখিতে পাই। ঐ বিস্ফোরণ ফলে সূর্য্য হইতে অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তেজ কণাগুলি প্রচণ্ডবেগে বিশ্বে ছড়াইতে থাকায় মহাকাশে এক প্রকার বিশেষ চাঞ্চল্য

হয়। তাহার পর পৃথিবী হইতে চারি পাঁচ শত মাইল উর্দ্ধে অতি শীতল স্তরের জমাট নাইট্রোজেনের অতি সূক্ষ্ম দানাগুলির উপর সৌর জগৎ হইতে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ কণাগুলি প্রচণ্ড বেগে আসিয়া আঘাত করিলে মেরুপ্রভার মত অতি অপূর্ব্ব আলোকমালার জন্ম হয়। এই বর্ণচ্ছটা বৈদ্যুতিক গুণ সম্পন্ন হওয়ায় পৃথিবী চুম্বকের উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত দুইটি উহাকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সেইজন্য মেরুপ্রভা কেবল মাত্র মেরু প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক গুণযুক্ত না হইলে ঐ অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা পৃথিবীতেই দেখিতে পাওয়া যাইত।

রসায়ন

মৌলিক পদার্থ (Elements) কি ?

সকল পদার্থই কতকগুলি মূল পদার্থের মিলনে বা মিশ্রণে গঠিত। সকল পদার্থই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা এমন কতকগুলি পদার্থকণার মিলনে গঠিত, যে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে কণাগুলি আর ভাঙ্গিতে পারা যায় না। জলকণা তীব্র বৈদ্যুতিক তেজের আঘাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শেষ পর্য্যন্ত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুইটি ধূম (gas) পাওয়া যায়, এইগুলিকে আর কিছুতেই সূক্ষ্মতর অংশে ভাঙ্গিতে পারা যায় না। এই চরম পদার্থ কণাগুলিকে মৌলিক পদার্থ বলে।

এপর্য্যন্ত এইরূপ ৯০টি মৌলিক পদার্থ মুক্ত করিতে পারা গিয়াছে এবং মনে হয় যে আরও ২টির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সেগুলিকে এখনও যৌগিক পদার্থের (compound) গর্ভ হইতে মুক্ত করিতে পারা যায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এই মূল পদার্থগুলিকে তাহাদের ইংরাজি নামের আদি অক্ষর দিয়া প্রকাশ করেন। যেমন ;

Hydrogen (হাইড্রোজেন) = H

Carbon (কার্ব্বন) = C

Oxygen (অক্সিজেন্) = O

Sulpher (সালফার) = S ইত্যাদি।

অঙ্গারজাত ধূম (Coal gas) কেন জ্বলে ?

অঙ্গারজাত ধূম কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের মিলনে গঠিত। উভয় পদার্থেরই অক্সিজেন-আসক্তি অতিশয় তীব্র। সেইজন্য তাপের সাহায্য পাইলেই কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন উভয়েরই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সহিত মিলন ঘটে। এইরূপ মিলন ঘটিলেই আমরা বলি ধূম জ্বলিতেছে।

সাবানে ময়লা কাটে কেন ?

জলে সাবান গুলিয়া ফেনা করিলে সাবানের ক্ষার মুক্ত হইয়া ময়লাকে তৈলাদির গর্ভ হইতে মুক্ত করে ; তখন ধুইয়া ফেলিলে ময়লা শীঘ্রই উঠিয়া যায়।

হিলিয়াম কি ?

এক প্রকার লঘু গ্যাস। ইহা একটি মূল পদার্থ। হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, ভারে তাহার পরই হিলিয়াম। হিলিয়াম বায়ুর তুলনায় এক সপ্তাংশ লঘু। ইহা কানাডা ও আমেরিকার খনি হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা জ্বলে না বলিয়া ধূমযান (Balloon) বা বায়ুপোতকে (Zepline) লঘু করিয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন জলাশয়ের জলে সাবান গুলিলে ফেনা হয় না কেন ?

অধিক পরিমাণে লবণ বা ক্ষার মিশ্রিত জলে, সাবান গুলিলে ফেনা হয় না। এই জল ফুটাইয়া লইলে ইহার লবণ ও ক্ষারের কতক অংশ পাত্রের গায়ে লাগিয়া কমিয়া যায়, তখন উক্ত প্রকার শোধিত জলে সাবান গুলিলে বেশ ফেনা হইবে। যে সকল স্থানে প্রচুর চূণ পাওয়া যায়, সেই স্থানের জলাশয়ের জলে এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ জলকে 'খর জল' (Hard Water) বলা চলে। যে

জলে সাবানের ফেনা হয় তাহাকে 'মৃদু জল' (Soft Water) বলিলে ভুল হইবে না।

কলের জল (Filtered Water) অপেক্ষা বৃষ্টির জল অধিক 'মৃদু', কারণ জলাশয় হইতে জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবার কালে লবণ ক্ষারাদি সঙ্গে লয় না, ফলে ঐ বাষ্প আবার বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে ফিরিয়া আসিলে অতিশয় 'মৃদু জল' রূপেই পাওয়া যায়।

জলের মধ্যে আলো জ্বলিতে পারে কি ?

যদি এমন বেগে বায়ু বা অক্সিজেন আলোর মুখে যোগান দেওয়া যায় যে তাহার চাপে জল দূরে সরিয়া থাকিবে, আলোক স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে জলের ভিতরেও আলো জ্বলিতে থাকিবে, নিবিবে না। এইরূপ উপায়ে ডুবুরীরা সমুদ্রতলে আলো জ্বালিয়া কাজ করে।

সুরাসার (Alcohol) কি ?

আলু, গম, মল্ট, চাউল, বিট, গুড়, মধু ইত্যাদি মধুর স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য বকযন্ত্রে (still) চোলাই করিলে সুরাসার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা লঘু ও জল ইহাতে নিঃশেষে গুলিয়া যায়। ইহা খাইলে মত্ততা আসে। সুরামাত্রেই অল্পাধিক সুরাসার থাকে বলিয়া সুরা পান করিলে মত্ততা আসে। সুরা পান করিলে যকৃত আদি দেহের যন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি হয়। ক্রমাগত সুরাপানে বহুস্থলে মানুষকে পাগল হইতেও দেখা গিয়াছে।

ক্লোরোফর্ম্, ইথার, দ্রব্যসার (essence), গন্ধ দ্রব্য, লোসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে সুরাসারের প্রয়োজন হয়। তৈল, চর্ব্বি, ধুনা, গঁদ, গালা ইত্যাদি সুরাসারে নিঃশেষে গুলিয়া যায়।

কোন কোন গ্যাস কিছুতেই জ্বলে না কেন ?

নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাসগুলি সহজে অক্সিজেনের সহিত মিলিতে চাহে না বলিয়া জ্বলে না।

Plaster of Paris কি ?

জিপ্সাম্ (Sulphate of Calcium) নামে একপ্রকার খনিজ পদার্থকে চূণের মত পোড়াইয়া খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করা হয়। ইহাকে প্লাস্তার অভ্ প্যারি বলে। অনেকটা দেখিতে চূণের মত। জলের সহিত মিশাইয়া কায়ের মত করিলে খুব শীঘ্র জমিয়া শক্ত হয়। এইজন্য নানা প্রকার ছাঁচ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

Galvanised Iron কি ?

লোহার পাতকে গলিত দস্তার মধ্যে ডুবাইয়া দস্তার কলাই করিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে লোহা জল বায়ুতে শীঘ্র জঙ্গ ধরিতে পায় না।

Stainless (যাহাতে মরচে ধরে না) Steel কি ?

ইস্পাতের গলিত অবস্থায় সামান্য নিকেল ও ক্রোমিয়াম নামক দুইটী ধাতু মিশাইয়া লইলে তাহাতে মরিচা ধরিতে পারে না।

টিন কি ?

আমরা সাধারণতঃ টিন যাহাকে বলি, তাহা খুব পাতলা ইস্পাতের চাদরের উপর টিন (*tin*) নামক এক প্রকার ধাতুর কলাই করা মাত্র। ইহাতে সহজে মরিচা ধরে না।

পদার্থ কঠিন হয় কেন ?

প্রতি পদার্থ অণু পরমাণুতে গঠিত। এই অণু পরমাণুগুলি অনবরত নিজেদের মধ্যে টানাটানি করিতেছে। এই টানাটানির ফলে যখন তাহারা এক স্থানে জড় হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায় তখন সেই পদার্থটী কঠিনরূপ ধারণ করে।

পদার্থ তরলরূপ ধারণ করে কেন ?

উপযুক্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থের অণুগুলির আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়ে।

তখন তাহারা আর নিজেদের মধ্যে টানাটানি করিয়া জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। ফলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও ঐ অণুগুলিকে টানিতে থাকায় ঐগুলি নিজের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সেইজন্য ঐ পদার্থের অণুগুলি কোন পাত্রে রাখিলে গড়াইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থাকে লোকে তরল অবস্থা বলে।

আরও অধিক তাপ দিলে পদার্থ বাষ্পের আকার ধারণ করে কেন ?

পদার্থের অণুগুলি নিজেদের মধ্যে যে টানের ফলে তরল অবস্থায় ছিল বেশী তাপে সে টানও শিথিল হইয়া আসে। তাপের মাত্রার সহিত এই শিথিলতার মাত্রাও বাড়িতে থাকে। তখন অণুগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পদার্থের এই অণুগুলি ছাড়াছাড়ি হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ার নাম বাষ্পীভূত হওয়া।

বারুদ কি ?

কয়লার গুঁড়া, গন্ধক ও সোরার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

কাঁচ কি ?

সাধারণতঃ মৃত্তিকাসার বা বালি, মেটে সিঁন্দুর ও পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেট্ গালাইলে গেলাস্ আদি প্রস্তুত করিবার মত কাঁচ পাওয়া যায়। সাসীর কাঁচ পাইতে হইলে বালি, চূণ, ও সোডা (সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট) গালাইতে হয়।

এবং বালি, গ্যাসলাইম্ (gas lime) ও লবণ গালাইলে বোতল প্রস্তুত করিবার মত কাঁচ পাওয়া যায়।

খাঁটী সোনা কি না জানিবার উপায় কি ?

নাইট্রিক্ য়্যাসিড দিলে খাঁটি সোনা হইলে কোন দাগই হইবে না। কিন্তু তামা বা পিতলের উপর দিলে সবুজ দাগ পড়িবে।

আলেয়া কি ?

জলাভূমিতে নানা উদ্ভিদ পচিয়া Marsh gas নামে এক প্রকার জলীয়বাষ্প জন্মায়। এই গ্যাস মাটী হইতে কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই আপনি জ্বলিয়া উঠে। এই গ্যাস এত লঘু যে মানুষের বা জীবজন্তুর চলার সময় বায়ুমণ্ডলে যে ঢেউ উঠে, তাহাতেও ইহা সরিয়া সরিয়া যায়। এই জন্য ইহাকে অনুসরণ করিলে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। শ্মশানে বা নির্জ্জন জলায় এইরূপ আলো দেখিয়া লোকে ভয় পায়। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই।

খড়ি কি ?

এক প্রকারের সাদা, নরম মাটি : প্রায় বিশুদ্ধ কার্ব্বনেট অভ্ লাইম [Carbonate of lime] বলা চলে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে খড়ি অতি ক্ষুদ্র জলজ জীবের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জীবগুলি মরিয়া গেলে কঙ্কালগুলি সমুদ্রের তলদেশে গিয়া স্তরে স্তরে জমা হয়। এই কঙ্কাল জমাটকে আমরা খড়ি বলি।

মিথিলেটেড্ স্পিরিট্ (Methylated Spirit) কি ?

সুরাসারে (Alcohol), কাষ্ঠজাত বিষাক্ত সুরা ও কেরাসিন তৈল মিশাইয়া ইহাকে অপেয় করিয়া ফেলা হয়। এই অপেয় সুরাসারকে লোকে মিথিলেটেড স্পিরিট বলিয়া জানে। ইহার জন্য সরকার বাহাদুরকে কোন মাশুল দিতে হয় না বলিয়া ইহা বিশুদ্ধ সুরাসার অপেক্ষা বহুগুণ সুলভ ; সেইজন্য আমাদের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

সেলুলয়েড্ কি ?

গান্ কটন্ (gun cotton) নামে একপ্রকার বারুদ ও কর্পূর সুরাসারের সহিত ঠাসিলে ময়দার মত তাল পাকান চলে। এই পদার্থ আগুনে তাতাইলে

নরম হয় বলিয়া ইচ্ছামত নানা আকারে পরিণত করিতে পারা যায়। ইহাকেই সেলুলয়েড্ বলে।

কাটিলে নাসপাতির শাঁসে শীঘ্রই লাল আভা ধরে কেন ?

খোসা ছাড়াইলেই ফলের কোমল শাঁস বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়নিক মিলনের ফলে লালবর্ণ গ্রহণ করে।

সাবানে ময়লা কাটে কেন ?

সাবান জলে গুলিলে সাবানের ক্ষার বাহির হইয়া আসে এবং তাহা ময়লার সহিত সহজেই ভাল করিয়া গুলিয়া যাইতে পারে। তখন জিনিষটি জলে ধুইয়া লইলেই ময়লা বাহির হইয়া যায়।

রেডিয়াম্ (Radium) কি ?

ইহা পিচ্ব্লেণ্ড্ (pitchblende) নামে এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পদার্থের তেজ বিকীরণের এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। রেডিয়াম্ বহুদিন তেজ বিকীরণ করিয়াও নিস্প্রভ হয় না। ইহাকে এক প্রকার অক্ষয় প্রদার্থ বলাও চলে। ইহার তেজ প্রয়োগ করিয়া আজকাল নানা ব্যাধির উপশমের চেষ্টা হইতেছে।

এই অদ্ভুত পদার্থটা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী কুরী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

গরম জলের কেৎলির ভিতর পাথর জমে কেন ?

জলে কিছু চূণ থাকে। জল ফোটাইবার সময় এই জলের চূণটুকু পাত্রের গায়ে লাগিয়া যায়। ক্রমে বহুদিন পরে চূণের পলি পড়িয়া পড়িয়া পাথরে পরিণত হয়।

আমাদের দেহ

জীবে আহার গ্রহণ করে কেন ?

(১) দেহের পুষ্টির জন্য (২) দেহের নিত্য ক্ষয় পুরণের জন্য (৩) দেহে তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য (৪) কার্য্য করিবার শক্তি লাভের জন্য।

ভয় পাইলে জীব জন্তুর মাথার বা দেহের চুল দাঁড়িয়ে উঠে কেন ?

প্রতি লোমের নীচে একটী করিয়া ছোট মাংসপেশীর বাঁধন আছে। ভয় পাইলে, এই বাঁধনটী সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে চুলে টান পড়ে এবং চুল দাঁড়াইয়া উঠে। আমাদের অপেক্ষা বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি পশুতে এইরূপ

অবস্থা বেশী সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চুল এত খাড়া হয় যে ইহারা তখন দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। সেইজন্য তখন ইহাদের
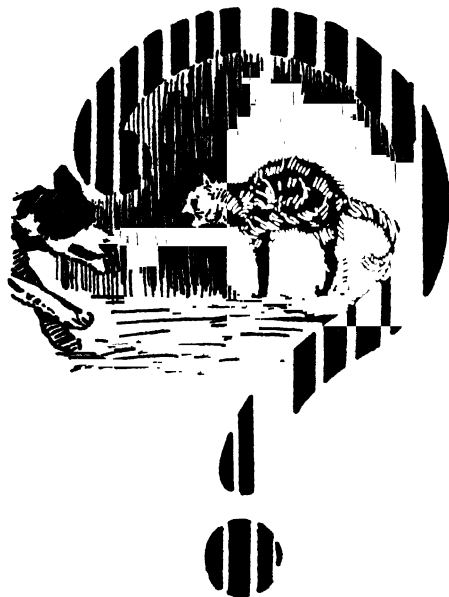
সম্মুখে ইহাদের শত্রুরা যাইতে সাহস করে না; ফলে শত্রুর হাত হইতে ইহাদের আত্মরক্ষা করিবার সুবিধা হয়।

আমরা ঘামি কেন ?

ঘামে দুটী কাজ হয়।

(ক) ঘামের স্রোতে আমাদের লোমকূপ দিয়া দেহের বহু ময়লা বাহির হইয়া গিয়া দেহকে সুস্থ রাখে।

(খ) ঘামে দেহকে ঠাণ্ডা রাখিয়া দেহের উত্তাপ বাড়িতে দেয় না।

জ্বরের সময় ঘাম বন্ধ হইলে জ্বর বাড়ে (দেহের তাপ বাড়ে) ও গা জ্বালা করে। ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই জ্বর কমিতে থাকে এবং রোগী একটু সুস্থ বোধ করে।

মুখ দিয়া নিঃশ্বাস না লইয়া নাক দিয়া লওয়া উচিত কেন ?

বাতাস ধূলিকণা ও অসংখ্য বিষাক্ত রোগের বীজাণুতে পূর্ণ। মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইলে বিষাক্ত ধূলিশুদ্ধ বাতাস ফুস্‌ফুসে গিয়া নানা রোগের সৃষ্টি করে। নাকে লোম ভর্ত্তি থাকায়, ধূলি ছাঁকিয়া কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বাতাসটুকু ফুস্‌ফুসে যাইতে পায়। তাহাতে রোগের ভয় থাকে না। সেইজন্য মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস লইবার অভ্যাস করা উচিত।

খুব জোরে দৌড়িলে বা পরিশ্রম করিলে আমরা ঘামি কেন ?

মাংসপেশীগুলির অত্যধিক পরিশ্রমে দেহ অত্যন্ত তাতিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ আমাদের চামড়ার ঘর্ম্ম-গ্রন্থিগুলির মুখ খুলিয়া গিয়া চামড়ার উপরে ঘাম বাহির হইয়া দেহকে শীতল করে।

এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ দেহকে ঠাণ্ডা করিয়া ঘাম বন্ধ করিতে নাই; বরং এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে প্রচুর ঘাম বাহির হয়। হঠাৎ ঘাম বন্ধ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; সেইজন্য বহুদূর দৌড়ের পর, যে দৌড়ায় তাহাকে গরম বস্ত্রাদি পরাইয়া বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়।

আমরা চোখের পাতা ফেলি কেন ?

আমাদের চোখ যখন খোলা থাকে, তখন বাতাস হইতে ধূলা, বালি, কত রকম রোগের বীজাণু ইত্যাদি নানা আবর্জ্জনা আসিয়া চোখে পড়িয়া চোখের উপরের পর্দ্দাটী শুখাইয়া তুলে। এই পর্দ্দাটী বেশী শুখাইয়া গেলে আমরা ভাল দেখিতে পাই না। সেইজন্য ঐটী যাহাতে না শুখায় এবং বেশ পরিষ্কার থাকে তাহার ব্যবস্থা করা আছে। চোখের উপর জল উৎপন্ন করিবার জন্য অশ্রুগ্রন্থি (Tears Gland) বলিয়া একপ্রকার গ্রন্থি আছে। ইহার কাজ সর্ব্বদাই বিন্দু বিন্দু চোখের জল উৎপন্ন করা। চোখের পাতা ফেলিলেই সেই জল উৎপন্ন হইয়া চোখের পর্দ্দাটী ধুইয়া দেয়।

জোরে হাসিলে বা খুব বেশী দুঃখ পাইলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে কেন ?

আমাদের চক্ষুর বাহিরের দিকে অক্ষিগোলক ও উপরের পাতার মাঝে একটী করিয়া বিশেষ গ্রন্থি আছে। ইহার কাজ জল উৎপন্ন করিয়া চোখ দুটীকে মাঝে মাঝে ধুইয়া ভিজাইয়া রাখা। সাধারণতঃ এই জল নাকের পাশের একটী অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া নাকে আসিয়া পড়ে। কিন্তু অতিরিক্ত হাসি, আনন্দ বা দুঃখে এত জলের সৃষ্টি হয় যে নাকের পাশের এই ছোট ফুটা দিয়া তত জল নাকে যাইতে পারে না। ফলে চোখের জলে মুখ ভাসিয়া যায়।

মানুষে হাই তোলে কেন ?

শরীরের ক্লান্তি বা রক্তে অক্সিজেনের অভাবই হাই উঠার একমাত্র কারণ। মানুষ যখন কোন কারণে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতে

থাকে, তখন তাহার রক্তে অক্সিজেনের অভাব হইলে মস্তিষ্কে সেই সংবাদটী পৌঁছে। তৎক্ষণাৎ খুব জোর দীর্ঘশ্বাসের সহিত একাধিক হাই উঠে। ফলে একসঙ্গে অনেকখানি বাতাস আমাদের দেহে প্রবেশ করে বলিয়া অক্সিজেনের অভাব মিটিয়া যায়।

আমরা বেদনা অনুভব করি কেন ?

বেদনায় আমরা জানিতে পারি যে, বেদনার স্থানে কোন আঘাত লাগিয়াছে বা সেই স্থানে কোন রোগ হইয়াছে। বেদনা আমাদের সাবধান করে। বেদনা না অনুভব করিলে শরীরের কোনস্থানে বিশেষ ক্ষতি হইলেও সময় থাকিতে জানিতে পারিব না, ফলে চিকিৎসার অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ধর দাঁতে বেদনা হইতেছে ইহাতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, আর দাঁতের চিকিৎসা করা উচিত। তাহা না হইলে দাঁতটী নষ্ট হইতে পারে।

বুকে ধুক্ ধুক্ শব্দ হয় কেন ?

হৃৎপিণ্ডের কাজ হইতেছে পরিস্কৃত রক্ত শরীরের চারিদিকে পাঠান আর ময়লা রক্ত টানিয়া লইয়া ফুস্‌ফুসে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এইজন্য পাম্প করিতে হয় এবং হৃৎপিণ্ড এই পাম্প দিনরাত অবিরাম করিতেছে। ইহা বন্ধ হইলে মানুষ মারা যায়। এই পাম্প কাজ করিবার সময় ধুক্ ধুক্ শব্দ করে।

ধমনীর রক্ত লাল ও শিরার রক্ত কাল কেন ?

ফুস্‌ফুস্ রক্ত পরিষ্কার করিয়া দিলে, তাহা যে নালীগুলি দিয়া পুনরায় শরীরের সর্ব্বাংশে অক্সিজেন পূর্ণ প্রাণশক্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, সেগুলিকে ধমনী বলে। এই পথে কেবল মাত্র পরিষ্কৃত টাট্‌কা অক্সিজেন পূর্ণ রক্ত যায় বলিয়া এত লাল।

যে নালীগুলি দিয়া শরীরের আবর্জ্জনা পূর্ণ রক্ত পুনরায় পরিষ্কৃত হইবার জন্য ফুস্‌ফুসে ফিরিয়া আসে, সেগুলিকে শিরা বলে। এ রক্ত ময়লায় ভরা, অক্সিজেন শূন্য বলিয়া তাহার রং কাল। এই ময়লা রক্ত ফুস্‌ফুসে ফিরিয়া গেলে সেখানে নিঃশ্বাস বাহিত শুদ্ধ অক্সিজেনে পরিষ্কৃত হয়। এইরূপে দেহের ময়লার কতক অংশ অক্সিজেনের সহিত জ্বলিয়া বায়বীয় অংশরূপে অশুদ্ধ গ্যাসে পরিণত হইয়া প্রশ্বাসরূপে বাহির হইয়া যায়; এবং দেহের ময়লার তরল ও কঠিন অংশ মল, মূত্র ও ঘাম ইত্যাদিরূপে অন্যপথে বাহির হইয়া যায়।

শরীরের কোন ধমনী কাটিয়া গেলে লাল টাট্‌কা রক্ত হৃৎপিণ্ডের শব্দের তালে তালে ফিন্‌কি দিয়া বাহির হয়; কিন্তু শিরা কাটিয়া গেলে কাল রক্ত একই ভাবে ধীরে ধীরে বাহিরে আসে।

আঘাত লাগিলে কাল দাগ পড়ে কেন ?

কোথাও আঘাত লাগিলে, সেইখানে ভিতরের ক্ষুদ্র ধমনী দুই একটী ছিঁড়িয়া গিয়া দেহের ভিতরে অল্প অল্প রক্ত বাহির হইয়া জমিয়া যায়। চামড়ার নীচে রক্ত বাহির হয় বলিয়া চামড়া কাল দেখায়। ইহাকেই কালশিরা পড়া বলে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি কেন ?

আমরা পরিশ্রম করিলেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় আবর্জ্জনা রূপে রক্তে ভাসে। রক্ত ইহাকে পরিষ্কার করে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অতিরিক্ত ক্ষয় হয়। অতিরিক্ত ক্ষয় হইলে রক্ত এত আবর্জ্জনা বহিতে পারে না। এই নোংরা জিনিষগুলি শরীরে একটা বিষের সৃষ্টি করে, সেইজন্য আমরা একটা অবসাদ অনুভব করি। ক্রমশঃ রক্ত সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে পারিলে আবার আমরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারি। সেইজন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর দেখা উচিত যে রক্ত পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত যত কম সম্ভব ময়লা রক্তে মিশে। পরিশ্রম না করিলেই ইহা সম্ভব। সেইজন্য বিশ্রাম করা দরকার।

হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ (খাল) ধরে কেন ?

হাত, পা মুড়িয়া বসিলে বা অন্য কোন কারণে রক্ত চলাচলের অসুবিধা হইবার পর আবার যখন রক্ত চলাচল করিতে থাকে তখন এই খাল ধরার অনুভূতি ঘটে।

বাড়ীতে কোন রোগ হইলে ভিক্ষা দিতে নাই কেন ?

ভিক্ষাদত্ত দ্রব্যের সহিত বাড়ীর রোগ চারিদিকে ছড়াইতে পারে বলিয়া; বাড়ীতে কোন রোগ হইলে, ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ।

পিঁয়াজের মত ঝাঁঝাল বস্তু কাটিয়া চোখের সামনে ধরিলে চোখ দিয়া জল পড়ে কেন ?

পিয়াজ কাটিলে তাহা হইতে এক প্রকার তীব্র বাষ্প উঠিয়া আমাদের চোখে লাগিবামাত্র চোখ জ্বালা করে। এই জ্বালা ঠাণ্ডা করিবার জন্য অশ্রুগ্রন্থিগুলি জল সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে।

ক্ষুধা পায় কেন ?

ক্ষুধা জানাইয়া দেয় যে দেহের খাদ্য ফুরাইয়াছে। তখন আহার না পাইলে দেহ নিজের চর্ব্বি খাইয়া দেহের কার্য্য চালাইবে, ফলে দেহের ক্ষয় হইবে।

অধিক খাইলে ঘুম পায় কেন ?

খাইবার পর আহার গ্রহণের জন্য দেহের রক্ত পাকস্থলীর দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে মাথায় রক্তস্রোতের অল্পতা হেতু তন্দ্রা লাগে।

লোকে তোত্‌লা হয় কেন ?

মুখ ও জিহ্বার মাংসপেশীর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতার অভাবে মানুষ ইচ্ছামত স্বাভাবিক কথা বলিতে পারে না। তাহাকে চেষ্টা করিয়া কথা বলিতে হয়। এই মুখ ও জিহ্বাকে বাগে আনিবার চেষ্টার ফলে তোত্‌লামি প্রকাশ পায়।

যৌবনের ঠিক পূর্ব্বে ছেলেদের গলার স্বর মোটা হয় কেন ?

বালক কিশোর অবস্থা ত্যাগ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিবার মুখে তাহার স্বরনালী (**Larynx**) খুব শীঘ্র বাড়ে ; এই বৃদ্ধির অনুপাতে তাহার ঐ স্থানের মাংসপেশীগুলি (**Vocal Chords**) তত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পারে না। সেইজন্য এই সন্ধিক্ষণে তাহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া পড়ায় একটা বিকৃত শব্দ বাহির হয়। ক্রমশঃ স্বরপেশীগুলি স্বরনালীর অনুপাতে বাড়িলে এই স্বর বিকৃতি কাটিয়া গিয়া পুরুষের মোটা আওয়াজ গলা হইতে বাহির হয়।

মেয়েদের বেলায় ইহা ঘটে না। তাহাদের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর-নালী ও স্বরপেশীগুলি ঠিক অনুপাত রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, ফলে মেয়েদের গলা সাধারণতঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

দেহের সামান্য কাটাও অবহেলা করিতে নাই কেন ?

রক্তদুষ্টির বীজাণু অতি ক্ষুদ্র। তাহারা চক্ষের অগোচরে কোনরূপে রক্তের সহিত মিশিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। সেইজন্য কোন স্থান কাটিয়া গেলে ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া টীঞ্চার আইয়োডিন (**Tincture of Iodine**) লাগাইয়া দেওয়া উচিত।

উদ্ভিদ্ জগৎ

উদ্ভিদ্ মানুষের কি উপকার করে ?

কাষ্ঠ, ঔষধি, তৈল ইত্যাদি মানুষ উদ্ভিদ হইতে লাভ করে। প্রাণীর পরিত্যক্ত প্রশ্বাস ও বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বণ-দ্বি-অক্সাইড (Carbon-di-Oxide) প্রাণীর পক্ষে বিষ স্বরূপ। এই বিষাক্ত ধূম নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া উহারা আমাদের প্রাণ স্বরূপ অক্সিজেন ধূম প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। এইরূপে উদ্ভিদ জগৎ বায়ুমণ্ডলের বায়ু ক্রমাগত শোধন করিয়া আমাদিগের আয়ু বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ইহা বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদবহুল স্থানে বর্ষণের সাহায্য করে। আবার উদ্ভিদাদির স্খলিত পত্রাদি পচিয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে।

বর্ত্তমান সভ্যতার সুখৈশ্বর্য্য কোন্ গাছের উপর অধিক নির্ভর করে ?

রবার গাছ। পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রেজিলে রবার গাছ জন্মিত, এবং তখন ইহা অত্যন্ত মূল্যবান বৃক্ষরূপে গণ্য হওয়ায় উক্ত বৃক্ষের বীজ বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা হইত, সেই জন্য কেহই ইহা অন্য দেশে লইয়া গিয়া চাষ করিতে পারিত না। তাহার পর ১৮৭৬ খ্রীঃ এক ইংরাজ নিজে একখানি সম্পূর্ণ জাহাজ ভাড়া করিয়া তাহাতে ব্রেজিল হইতে বহু বীজ লুকাইয়া লইয়া আসেন। বিলাতের কিউ (Kew) উদ্যানে এইগুলি রোপণ করিয়া চারা গাছ জন্মান হয়। ঐ চারাগুলি মালয় প্রভৃতি ভূখণ্ডের বর্ত্তমান রবার গাছগুলির পূর্ব্ব পুরুষ। আজ এই ভূখণ্ড হইতে লক্ষ লক্ষ মণ রবার পৃথিবীর নানা প্রদেশে রপ্তানি হয়।

রবার ব্যতীত মটর গাড়ির টায়ার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য Hot water bottle, Ice bag ইত্যাদি কিছুই প্রস্তুত করা সম্ভব হইত না। দক্ষিণ ভারতেও ইহার চাষ হয়। এই রবার গাছের রস হইতে কাঁচা রবার পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কোন্‌গুলি ?

ক্যালিফোর্ণিয়া (California) প্রদেশের রক্তকাষ্ঠ (Red wood) ও অষ্ট্রেলিয়ার (Australia) ইউক্লিপটাস বৃক্ষ। ইহারা উচ্চে ৪৩০ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা যায়। কোন কোন গাছের গুঁড়ি ভেদ করিয়া বনের মধ্যে পথ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন রক্তকাষ্ঠের বৃক্ষও পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার বৃক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ফল কোন্‌টি ?

কোকে দে মার (সামুদ্রিক নারিকেল) নামে এক জাতীয় নারিকেল ফল। এই বৃহৎ ফলের পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে প্রায় ছয় বৎসর লাগে; তখন ইহার ওজন হয় প্রায় অর্দ্ধ মণ।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাতা কোন্‌টি ?

পশ্চিম ইণ্ডিজে (West Indies) ক্যালেডিয়াম নামে এক প্রকার কচু গাছের মত গাছ জন্মে। উহার পাতা দৈর্ঘ্যে একটা মানুষের মত, পাঁচ ফুটের অপেক্ষাও বড়। এই পাতাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই দেশের লোকেরা ঐ পাতা খায়।

সাবুদানা কি ?

কয়েক প্রকার পাম্‌ জাতীয় (Palm) বৃক্ষের শাঁস হইতে সাবুদানা প্রস্তুত হয়। বেশ ভাল করিয়া গাছের শাঁস জলের স্রোতে ছাঁকুনি দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তাহার পর এই শাঁসকে কাইয়ের মত করিয়া লইয়া ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝরার উপর ভাল করিয়া চাপিয়া চাপিয়া ঠাসা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলে ঝাঁঝরার তলায় মিহিদানার মত দানা বাঁধিয়া সাবুর কাথ পড়ে। শুকাইলে ইহাকে আমরা সাবুদানা বলি।

কেশোয়াদানা কেশোয়া নামে এক প্রকার লতা গাছের মূল হইতে প্রস্তুত হয়। অনেকটা আমাদের দেশের শঠীর পালোর মত। মূলকে ভাল করিয়া পিশিয়া পরিষ্কার করিয়া উল্লিখিত প্রকারে দানা বাঁধান হয়।

কোন্‌ বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী ?

নারিকেল গাছ। ইহার ফলের শাঁসে খাদ্য ও তৈল, ছোবড়ায় দড়ি, খোলে হুকো ও বোতাম হয়। গাছের গুঁড়ি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার হয়। পাতায় ঘরের ছাউনি হয় এবং কাঠিতে ঝাঁটা হয়। নারিকেল গাছের মূল হইতে একটী মূল্যবান

ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার কোনটীই অপ্রয়োজনীয় নয়, গাছের প্রতি অংশই বিশেষ কাজে লাগে।

তারপিন তৈল কি ?

কয়েক প্রকার পাইন গাছের রস বক্র নলযুক্ত বদ্ধ পাত্রে জ্বাল দিলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। রস জ্বাল দিলে উদ্বায়ী তৈল বাষ্পীভূত হইয়া বাঁকা নল দিয়া বাহির হইয়া শীতল পাত্রে গিয়া জমিয়া থাকে। পাক পাত্রে যে কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকে তাহাকে ধূনা (resin) বলে। তারপিন অতি মূল্যবান তৈল। রং ও বার্ণিশের কাজে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

কর্ক কি ?

এক প্রকার ওক গাছের ছাল। এই প্রকার গাছ স্পেন ও পোর্টুগালে জন্মায়। আট দশ বৎসর অন্তর এই গাছের ছাল ছাড়াইয়া লওয়া হয়। প্রথম বারের ছাল শক্ত ও খস্‌খসে বলিয়া বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তাহার পরের বারের ছাল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইয়া ছিপি ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।

গাছের বয়স কি করিয়া জানা যায় ?

গুঁড়ি আড়াআড়ি চিরিলে বয়স ধরা পড়ে। গুঁড়িতে যতগুলি চক্রাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায় তত বৎসর গাছটীর বয়স ধরিতে হইবে। প্রতি বৎসর একটী করিয়া গাছের ছাল পড়িয়া একটী চক্রের সৃষ্টি হয়।

(Amber) কি ?

গাছের আটা (গঁদ বা ধূনা)। ইহা কোন অতীত যুগে বৃক্ষ হইতে গলিয়া পড়িয়া মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল। পরে মাটীর বিশাল চাপে জমিয়া প্রস্তরীভূত (Fossilised) হইয়া যায়। তাহার পর কালে ঐ সকল স্থানে সমুদ্র

কত বার আসিয়াছে, গিয়াছে। ফলে গাছের আটার ঐ প্রস্তরীভূত টুকরা বালির বা মাটীর স্তর হইতে সমুদ্রের ঢেউএর মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তীরে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্ম্মানি ও হল্যাণ্ডের উপকূলভাগে এই গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হরিদ্রাবর্ণ ও দেখিতে খুব স্বচ্ছ।

কুইনিন কি ?

সিনকোনা গাছের ছাল শুকাইয়া উহার কাথ হইতে ইহা বাহির করা হয়। ইহার আদি জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকা। এখন আমাদের দেশেও ইহার চাষ হয়। বাংলায় দার্জ্জিলিং, দক্ষিণে কুর্গ ও ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা সরকারের (Government) খাস (monopoly) ব্যবসা।

সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাঠ কি ?

ভারতীয় লোহা কাঠ। ইহাতে কাজ করিবার সময় প্রায়ই ইস্পাতের যন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়।

মেঘের সাথী
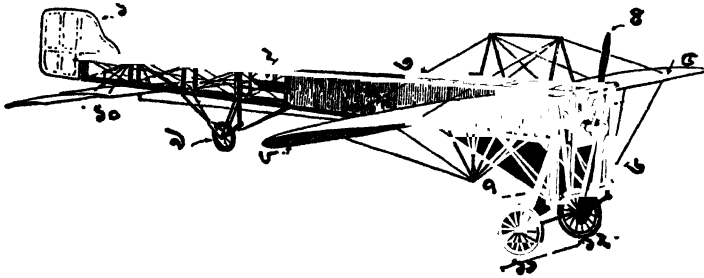
এরোপ্লেন ভারি হইয়াও আকাশে উড়িবার সময় মাটিতে পড়িয়া যায় না কেন ?

এয়োরোপ্লেনের মুখে একখানি বা কখনও একাধিক পাখা থাকে। উড়িবার সময় ইহা অতিবেগে ঘুরিতে থাকে। পাখাটি খুব জোরে ঘুরিয়া বায়ুস্রোতকে পিছনের দিকে অতিবেগে ঠেলিয়া দিতে থাকে। এই বিশাল বায়ুরাশি ভীষণ বেগে পিছন হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিবার সময় এয়োরোপ্লেনের ডানায় (plane) গিয়া উপরদিকে ধাক্কা দিতে থাকে। এই প্রকার ক্রমাগত বায়ুস্রোতের উপরদিকে ঠেলা পাইয়া এয়োরোপ্লেনটি ছুটিবার সময় নীচে পড়িয়া যায় না।
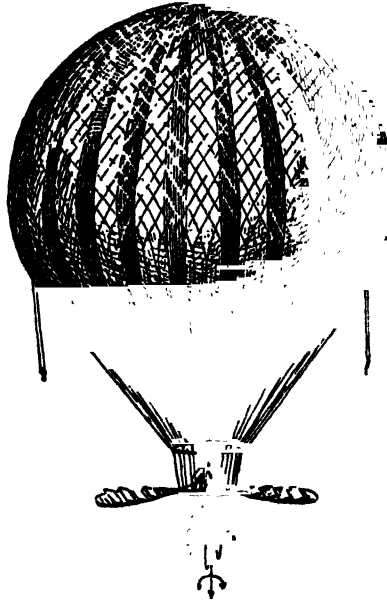
বেলুন উপরে উঠে কেন ?

বায়ুর বেলায় ঠিক জলের নিয়ম খাটে। যতটুকু আকারের (volume) জিনিষ বায়ুতে ভাসাতে চাও, উহা ঠিক ততটুকু আকারের (volume) বায়ু অপেক্ষা হাল্কা হওয়া চাই ; কেন না উহা বায়ু অপেক্ষা ভারি হইলেই মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

ছোট ছোট খেলিবার বেলুনের মধ্যে প্রচুর ধোঁয়া যাহাতে হইতে পারে এমন জিনিষে আগুন ধরাইয়া কিছুক্ষণ পরে বেলুন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গরম ধোঁয়া বায়ু অপেক্ষা হাল্কা, তাহার উপর আগুনের তাপে ফুলিয়া যতই হাল্কা হইতে থাকে ততই উপরের দিকে উঠিতে থাকে। তাহার পর আগুন নিভিয়া গেলে আকাশের ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারি বাতাস ঢুকিয়া বেলুনকে ভারি করিয়া তোলায় বেলুনটি মাটির দিকে নামিতে আরম্ভ করে।

পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বড় বড় বেলুনের সিল্কের থলির মধ্যে হাইড্রোজেনের মত বায়ু অপেক্ষা হাল্কা গ্যাস ভরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই হাল্কা গ্যাস সমেত বেলুনটি যতখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে, ততখানি আকারের বায়ু ওজন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বেলুনটার ওজন কম; সেইজন্য বেলুনটা উপরে উঠিতে থাকে।
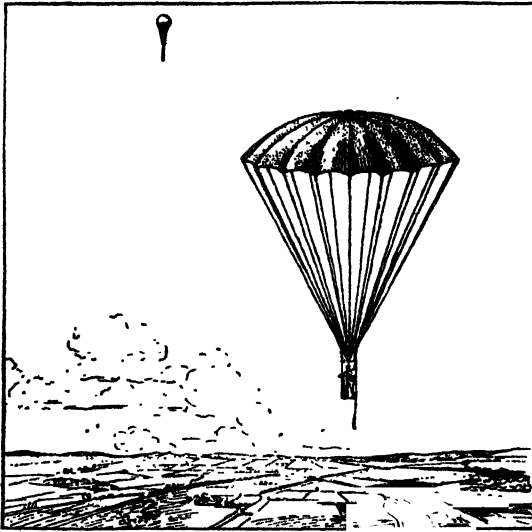
বৈমানিকগণ প্যারাসুত (parachute) ব্যবহার করে কেন?

প্যারাসুত অনেকটা ছাতার মত দেখিতে। ইহা বৈমানিকের পিঠে গুটাইয়া

বাঁধা থাকে। ইহা এমন ভাবে নির্ম্মিত যে বৈমানিকের বুকে আঁটা বোতাম টিপিলেই খুলিয়া যায়। কোন কারণে বিমান বিকল হইয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করিলে, বৈমানিকগণ আত্মরক্ষার জন্য শূন্যে লাফ দিয়া প্যারাসুতের বোতাম টিপিয়া দেয়। তাহার পর বায়ুর চাপে ক্রমশঃ প্যারাসুত খুলিতে থাকে এবং বৈমানিক মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। তখন এই প্যারাসুতে ভর করিয়া বৈমানিক মাটিতে নামিতে পারে, কোন বিপদ ঘটে না।

মানুষ কতদূর উচ্চে উঠিতে পারিয়াছে ?

কিঞ্চিদধিক ১০ মাইল উর্দ্ধে মানুষ উঠিয়াছে। জার্ম্মাণির ব্রাশেল্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিকর্ড সাহেব তাঁহার এক সঙ্গীর সহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুসন্ধানে বেলুনে চড়িয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে এক এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত বলের মধ্যে ছিলেন, এবং এই বলটিকে বেলুন হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই ধাতুনির্ম্মিত বলের মধ্যে থাকায় বাহিরের আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

কবে মানুষ প্রথমে বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিয়াছিল ?

১৭৮৩ খ্রীঃ ২১শে নভেম্বর তারিখে, দুইজন ফরাসী প্যারিস (Paris) নগরী হইতে একটি বৃহৎ ধূমপূর্ণ বেলুনে চাপিয়া আকাশে উঠিয়াছিলেন। বেলুনটি উর্দ্ধে ৩০০০ ফুট উঠিয়া প্রায় দুই মাইল গিয়াছিল। তাহার পর সেই বৎসরের ১লা ডিসেম্বর অধ্যাপক চার্ল্স্ প্যারিস নগরী হইতে হাইড্রোজেন্ গ্যাসে একটি বেলুন পূর্ণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর আকাশে উঠেন। তিনিও উর্দ্ধে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়া সেই দিনই আর একবার সূর্য্যাস্ত দেখিতে পান।

ঘুড়ি বেলুন কি ?

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য এক প্রকার বেলুন ব্যবহৃত হয়। বেলুনটি ভূমির সহিত একটি লোহার তার দিয়া বাঁধা থাকে, সেইজন্য ইহা বায়ুস্রোতে অন্য স্থানে উড়িয়া যাইতে পারে না, নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ঘুড়ির মত উড়িতে থাকে। এইরূপ বেলুনের তলদেশে ঘুড়ির পুচ্ছের মত একটি ঝুড়ি ঝুলিতে থাকে। এই ঝুড়ির মধ্যে লোক বসিয়া বিপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বপক্ষকে সংবাদ দিতে থাকে। এই ঝুড়িটি বেলুনের তলদেশে ঝুলিতে থাকায় বেলুনটি বায়ুস্রোতে বেশী দুলিতে পারে না। যখন বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৪০ মাইল অতিক্রম করে, তখন ঘুড়ি বেলুন ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। গত মহাযুদ্ধে ইংরাজগণ নৌযুদ্ধে স্বপক্ষীয় কামানগুলির লক্ষ্য ভেদের সুবিধার জন্য বিপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘুড়ি বেলুন ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কে প্রথমে এয়োরোপ্লেনে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়াছিলেন ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌসেনাধ্যক্ষ এ, সি, রীড তাঁহার তিনটী সহচরের সহিত প্রথমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে সমর্থ হন। তাঁহারা ১৯১৯ খ্রীঃ ১৫ই মে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland) হইতে যাত্রা করেন এবং পথে য্যাজোর্সে (Azores) হোটা ও পন্তাদেলগাদায় থামিয়া ২৭শে মে লিসবনে আসিয়া উপস্থিত হন।

ইউরোপ হইতে আমেরিকার দিকে কাপ্তেন জন্ আল্কক ও লেফটেনেণ্ট হুইট ব্রাউন কোথাও না থামিয়া প্রথমে আট্লাণ্টিক পার হন। তাঁহারা ১৪ই জুন যাত্রা করিয়া মাত্র ১৬ ঘণ্টায় ১৫ই জুন আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

কাহারা প্রথমে এয়োরোপ্লেনে চাপিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর ছয় জন বৈমানিক। তাঁহারা তিনটী বিমানে চাপিয়া ১৯২৪ সালের ৬ই এপ্রিল সীট্‌ল্ (Seatle) হইতে যাত্রা করেন। তাহার পর উপকূল দিয়া আলস্কার নিকট সমুদ্র পার হইয়া কম্‌স্‌কট্‌কায় আসেন। তাহার পর দক্ষিণে জাপান, চীন, শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্মদেশ পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এতদিন সমুদ্রের উপর দিয়া আসা হইতেছিল বলিয়া বিমানগুলির তলদেশে চাকার বদলে জলে পড়িলে ভাসিবার জন্য নৌকা বাঁধা ছিল। কলিকাতায় আসিয়া নৌকাগুলি খুলিয়া লইয়া চাকাগুলি পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ভারতবর্ষ, ইরান, আরব, তুর্কী ও ইয়োরোপ হইয়া তাঁহারা Hull বন্দরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আবার চাকাগুলি খুলিয়া লইয়া নৌকাগুলি পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর উত্তর সাগরের উপর দিয়া উড়িয়া আইস্‌ল্যাণ্ড (Iceland) ও গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে (Greenland) আসিলেন এবং তথা হইতে আটলাণ্টিক পার হইয়া লাব্রাদরে আসিয়া তাঁহারা বোষ্টনে (Boston) উপস্থিত হইলেন। তখন আবার বিমানগুলির তলদেশ হইতে নৌকাগুলি খুলিয়া লইয়া চাকাগুলি পরাইয়া বোষ্টন্ হইতে সীট্‌ল্ নগরে ১৯২৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পৌছিলেন। এই যাত্রায় তাঁহারা মোট ৩৩৬ ঘণ্টা উড়িয়া ২৬,৩৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করেন।

কত উচ্চে মানুষ উঠিতে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের কাপ্তেন ষ্টিভেন্স (Stevens) ও য়্যাণ্ডারসন্ (Anderson) বেলুনের সাহায্যে প্রায় ১৪ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আকাশে ৮ ঘণ্টা থাকিবার পর নামিয়া আসেন।

কে প্রথমে Stratosphere (সমতাপ বায়ুস্তরে) উঠিয়াছিলেন ?

১৯৩১ খৃঃ মে মাসে সুইস্ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক A. Piccard ও তাঁহার এক সহকারী Stratosphereএ প্রথম উঠেন।

তাঁহারা ১/২ ইঞ্চি পুরু য়্যালুমিনিয়ম চাদরের একটী ৭ ফুট ব্যাসের ফাঁপা গোলক প্রস্তুত করিলেন। ইহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত যে ইহার ভিতরের বায়ু আপনা আপনি বাহিরে যাইতে পারে না, ফলে ইহার ভিতরে বায়ুর চাপ মানুষের সহ্যমত অবস্থায় রাখা সম্ভব। এই গোলকটিকে একটি বৃহৎ বেলুন (ইহার আয়তন ছিল ৫০০,০০০ ঘন ফুট) হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা তাঁহাদের যন্ত্রপাতি লইয়া উক্ত গোলকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোলকের মুখ আঁটিয়া দিলেন। তাহার পর বেলুনটি হাইড্রোজেন ধূমে পূর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা ৫১,৪৫৮ ফিট উপরে উঠিবার পর দেখিলেন যে সূর্য্যের তাপে বেলুন এত তাতিয়াছে যে বেলুন মধ্যস্থিত হাইড্রোজেন ধূম অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় নীচে নামা অসম্ভব। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সূর্য্য ডুবিয়া গেলে, উক্ত স্তরের শীতলতায় বেলুনের গ্যাস শীতল হইলে তাঁহারা নামিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা Bavaria প্রদেশস্থ Augsburg হইতে বেলা চারিটায় উঠিয়া রাত্রি ১০টায় আষ্ট্রিয়া প্রদেশের আল্পস্ (Alps) পর্ব্বতের এক তুষার নদীতে আসিয়া অবতরণ করেন। পথ জানা না থাকায় তাঁহাদিগকে তথায় রাত্রি কাটাইতে হয়; পরদিন লোকেরা খুঁজিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে।

বায়ুপোতের বিফলতা :—

এ পর্য্যন্ত বৃহৎ বায়ুপোতগুলির (Zeplin) এক চুম্বক পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে এক গ্রাফ্ জেপ্লিন ব্যতীত সকলগুলিই মানুষের আশায় বাদ সাধিয়াছে।

		দৈর্ঘ্য	গ্যাস ধরিবার ঘন ফুট স্থান	ইঞ্জিনের সংখ্যা	অশ্বশক্তি	দ্রুততম গতি বেগ	কোন দেশের
১।	গ্রাফ্ জেপ্‌লিন	৭৭৬ ফুট	৩,৭০০,০০০	৫	২,৭৫০	৮০ মাইল	জার্ম্মাণি
২।	হিণ্ডেনবার্গ	৯৭২ „	৭,০০০,০০০	৪	৪,০০০	৮৪ „	ঐ
৩।	R 101	৮০০ „	৫,৫০০,০০০	৫	২,৯২৫	৭৭ „	ইংরাজ
৪।	আক্রন্	৭৮৫ „	৬,৫০০,০০০	৮	৪,৪৮০	৮৪ „	আমেরিকা
৫।	মার্কন	„	„	আক্রন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ইঞ্জিন ও অধিক গতি বেগ			ঐ
।	লস্ এঞ্জেলস্	৬৫২ „	২,৪৭০,০০০	৫	২,০০০	৭৩	ঐ

বায়ুপোত নষ্ট হওয়ায় যে প্রাণগুলি গিয়াছে তাহার একটা আনুমানিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

জাতি	বায়ুপোতের নাম	কতগুলি প্রাণ নষ্ট হইয়াছে
ফরাসী	দিক্সমদ্	৫৪
ইতালি	রোমা	৩৪
আমেরিকা	আক্রন্	৭৪
জার্ম্মাণি	হিণ্ডেনবার্গ	৪৫ (?)
ইংরাজ	R 101	

সকল দিক বিবেচনা করিলে যাত্রী ও মাল লইয়া বিস্তৃত সাগর পারাপারের জন্য বায়ুপোতই অধিক কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হয়। বলি বিনা কোন বড় বস্তুই এ পর্য্যন্ত মানুষ লাভ করিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত যে বলি পড়িয়াছে তাহাতে দেবতা তৃপ্ত হইয়াছেন কিনা কে বলিবে!

গ্রাফ্ জেপ্‌লিনের সফলতা সত্ত্বেও, সেদিন আমেরিকা হইতে ফিরিবার সময়ে হিণ্ডেন্‌বার্গ নামক জার্ম্মাণ বায়ুপোত হঠাৎ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাওয়ায়,

লোকের মনে এই জাতীয় আকাশযানের সম্পর্কে পুনরায় শঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইংরাজের বিরাট বায়ুপোত R 101 কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে লইয়া ভারত অভিমুখে আসিবার কালে ফ্রান্সে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতগাত্রে ঠেকিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া যাত্রীগুলির সহিত নষ্ট হওয়ায় বায়ুপোত সম্পর্কে একবার যে শঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহাই আবার দ্বিগুণরূপে দেখা দিয়াছে। আকাশচারীদিগের এ বিষয়ে দোষ নাই। গ্রাফ্ জেপ্লিনের প্রথমাবধি সফলতা ব্যতীত, আর কোন বায়ুপোতই স্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই, অধিকন্তু অনেকগুলি বহু যত্নে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত বায়ুপোত যাত্রাকালে নষ্ট হওয়ায় বিপুল অর্থ ও মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

কে প্রথমে বায়ুপোতে (Airship) পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ?

জার্ম্মাণির ডাঃ এক্নার গ্রাফ্ জেপ্লিনে ১৯২৯ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ইউরোপ ও এশিয়া হইয়া টোকিও আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর একদমে প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) পার হইয়া কালি-ফোর্ণিয়া প্রদেশে আসিলেন। তাহার পর আমেরিকার উপর দিয়া আটল্যাণ্টিক মহাসাগর ডিঙ্গাইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এয়োরোপ্লেনে কে কত উচ্চে উঠিয়াছেন ?

জাতি	উচ্চতা	তারিখ	নাম
ইংরাজ	৪৩,৯৭৬ ফুট	Sept. 1932	C. F. Uwins
ফরাসি	৪৪,৭৭৫ ”	1933	G. Lemoine
ইটালিয়ান	৪৭,৩৬০ ”	April 1934	Donati
রাশিয়ান	৪৭,৮০৬ ”	Nov. 1935	V. Kokinki
ইংরাজ	৫৩,০০০ ”	July 1937	
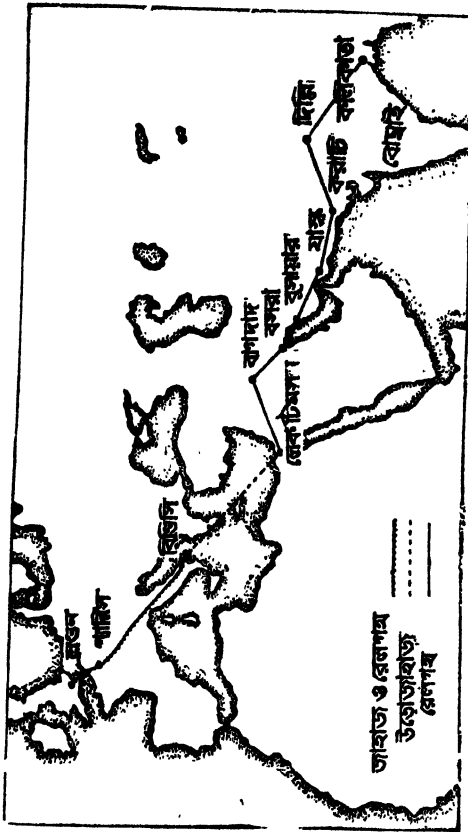
কাহারা প্রথমে এয়োরোপ্লেনে চাপিয়া ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় যান ?

কাপ্তেন Sir Ross Smith, তাঁহার ভ্রাতা Sir Keith Smith, W. H. Shiers ও J. H. Bennet. তাঁহারা ১৯২৯ খ্রীঃ ১২ই নভেম্বর যাত্রা

করিয়া ১০ই ডিসেম্বর ডারউইন বন্দরে উপস্থিত হন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করায় এত বিলম্ব হয়। তাঁহারা ১১,২৯৩ মাইল আকাশপথ মাত্র ১২৪ ঘণ্টায় উড়িয়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন।

বেলুনে কে কত উচ্চে উঠিয়াছেন ?

	জাতি	উচ্চতা	বেলুন	সাল
(১)	সুইস	৫১,৪৫৮ ফুট	৫০০০০০ ঘন ফুট	১৯৩১
(২)	রাশিয়া	৬০,০০০ ,,		১৯৩৩
(৩)	ঐ	১৩ মাইল		১৯৩৪

১৩ মাইল উচ্চ হইতে মানুষ শুদ্ধ গোলকটি বেলুন হইতে ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাওয়ায় মানুষগুলি মারা যায়।

(৪)	আমেরিকা	৬০,০০০ ফুট	৩,০০০,০০০ ঘন ফুট	১৯৩৪
(৫)	ঐ	৭৩,৩৯৫ ,,	৩,৭০০,০০০ ,,	১৯৩৫

ভৌগলিক

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি কোথায় হয় ?

চিরাপুঞ্জি পাহাড়, আসাম। এইস্থানে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যেই প্রায় ২৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এবং একা জুলাই মাসে এখানে ১২৫ ইঞ্চি জল হয়। সারা বৎসরে প্রায় ৫০০ ইঃ জল পড়ে।

চন্দ্র কোথা হইতে আসিল ?

বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে পৃথিবী যখন প্রথমে সূর্য্যের গর্ভ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসে, তখন এই জলন্ত অগ্নিপিণ্ড এত বেগে পাক খাইতেছিল যে এই ভীষণ পাকের কেন্দ্রবিমুখী শক্তির (Centrifugal) বেগ সাম্‌লাইতে না

পারিয়া পৃথিবীপিণ্ডের কতকাংশ ছিন্ন হইয়া আকাশে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। পৃথিবীচ্যুত ঐ অংশটুকু বর্ত্তমানে চন্দ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। বোধ হয় চন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমানে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইয়াছে।

সকল সময়েই চন্দ্রের একই পৃষ্ঠ আমাদের চোখে পড়ে কেন ?

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে যতখানি সময় গ্রহণ করে, ঠিক ততখানি সময়ই ইহার একবার পাক খাইতে লাগে। পৃথিবীকে চন্দ্রের সূর্য্য ধরিলে, চন্দ্রের বর্ষ ও দিন এক। ফলে যখনই আমরা চন্দ্র দেখি, তখনই তাহার সেই একই অংশ দেখিতে পাই।

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকের আব্‌হাওয়া অত্যন্ত জলীয়, কিন্তু উত্তর দিকের (তিব্বতের দিকের) আব্‌হাওয়া একেবারে শুষ্ক। আবার উচ্চ পর্ব্বতের নীচের দিকে আব্‌হাওয়া জলীয়, কিন্তু উচ্চস্তরে আব্‌হাওয়া বেশ শুষ্ক। এই তারতম্যের কারণ কি ?

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বাষ্পপূর্ণ বায়ুস্রোত পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া আর অগ্রসর হইবার পথ না পাইলে, পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপরে উঠিতে থাকে। ক্রমশঃ উপরিস্তরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুমধ্যস্থ বাষ্পরাশি জলকণায় পরিণত হইলে বৃষ্টিরূপে পাহাড়ের কোলে নামিয়া আসে কিম্বা অতি শীতল পাহাড়ের মাথায় বরফ রূপে জমিয়া শোভা পায়। এইরূপে বায়ুস্রোত সম্পূর্ণ বাষ্পশূন্য হওয়ায় অতি শুষ্ক অবস্থায় উপরে উঠিয়া পাহাড়ের অপর ধারে যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন বায়ুস্রোতে কিছুমাত্র বাষ্প নাই বলিলেই চলে। চিত্র দেখিলেই কারণটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

চন্দ্র কি পৃথিবীর গতির কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে?

চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। জোয়ার ভাঁটার গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী, কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে। পৃথিবীর এই দুইটী গতি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রতিকূলে অনেকটা মোটর গাড়ীর ব্রেকের (Brake) মত ব্যবহার করে। কিন্তু এই ব্রেকের প্রভাব এত ক্ষীণ যে লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর বৎসর এক সেকেণ্ড করিয়া বাড়িতেছে।

চন্দ্র শীতল হইয়াও কিরূপে আলো দেয়?

সূর্য্যালোক চন্দ্রে পড়িয়া পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হওয়ায় আমরা চাঁদের আলো উপভোগ করিতে পারি।

চন্দ্র কি কেবলমাত্র রাত্রেই আলো দেয়?

না। ইহা দিক্‌চক্রবালের উপরে দেখা দিলেই সূর্য্যালোক ইহার পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। দিনেও সেইজন্য চন্দ্রকে আকাশে রূপার থালার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের আলোর তীব্রতায় চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত আলোক তেমন উজ্জ্বল দেখায় না।

চন্দ্র না থাকিলে কি হইবে?

দৃশ্যতঃ চন্দ্রের অভাবে, জোয়ার ভাঁটার তীব্রতা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ফলে বহু নদনদী ও সাগরে নৌকা চলাচলে বিঘ্ন ঘটিবে এবং বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে। রাত্রের অন্ধকার কিছু বাড়িবে। চন্দ্রের অভাবে সকল দেশে বোধ হয় কবির অভাবও বাড়িবে!

সূর্য্য কি?

সূর্য্য আকাশের তারকামণ্ডলীর মধ্যে একটী। ইহার কেন্দ্র-পিণ্ড অতিশয় উষ্ণ, ইহা ব্যতীত আমরা আর অধিক কিছু জানি না। ইহার ঐ উত্তপ্ত পিণ্ড

তিনখানি জলন্ত গ্যাসের আবরণে আবৃত। সূর্য্যের তীব্রাগ্নিশুভ্র গর্ভদেশ হইতে বিকীর্ণ তেজরাশি উক্ত আবরণত্রয় ভেদ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহার ব্যাস আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ। কিন্তু ইহা অন্যান্য বহু তারকার তুলনায় কি তেজে, বা কি আয়তনে অতি নগণ্য বলিলেই চলে।

সৌরকলঙ্ক কি ?

কখন কখন সৌরপৃষ্ঠে বহু যোজন ব্যাপিয়া অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত দেখা দেয়, এবং উক্ত ক্ষতের ধারে ধারে গগণচুম্বী বিরাট অগ্নিশিখা দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন কোন ভীষণ বিস্ফোরণে সৌরপৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়া গর্ভদেশ হইতে বাড়বানল তাহার লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া দিয়াছে। সৌরকলঙ্কের প্রকৃত রহস্য এখনও ঠিক ধরা পড়ে নাই, তবে সৌরপৃষ্ঠে উক্ত ক্ষতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবীতে এমন ভীষণ বৈদ্যুতিক গোলযোগ উপস্থিত হয় যে পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

চন্দ্রের কলঙ্ক কি ?

চন্দ্রের শৈশবে যখন উহার পৃষ্ঠদেশ জমিয়া কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয় নাই, সেই যুগের অসংখ্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ফলে চন্দ্রের পৃষ্ঠে বহু গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল। কালে সেইগুলি জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। সেইগুলি হইতে সূর্য্যালোক সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না বলিয়া ঐ স্থানগুলি চন্দ্রের উজ্জ্বল পার্ব্বতীয় প্রদেশগুলির তুলনায় সামান্য ম্লান দেখায়। পৃথিবী হইতে সেই ছায়াকৃষ্ণ নিম্নস্থানগুলিকে চন্দ্রপৃষ্ঠে কলঙ্কের মত দেখিতে হয়।

মধ্যাহ্নে সূর্য্যের ছায়া ক্ষুদ্রতম হয় কেন ?

সূর্য্য তখন ঠিক মাথার উপরে আসে বলিয়া ছায়া অতি ক্ষুদ্র হয়।

গ্রহ ও উপগ্রহ কি ?

পৃথিবীর মত যে জোতিষ্কগুলি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলিকে গ্রহ বলে এবং যেগুলি কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলিকে উপগ্রহ বলে।

তারকা কি ?

তারকাগুলি বহুদূরে অবস্থিত এক একটি সূর্য্য বিশেষ। তারকাগুলি বহুদূরে থাকায় স্থির বলিয়া মনে হয়। এবং গ্রহ ও উপগ্রহগুলি নিকটে বলিয়া উহাদের গতি চক্ষে ধরা পড়ে।

ধূমকেতু কি ?

কখন কখন আকাশে ঝাঁটার মত দেখিতে এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হঠাৎ দেখা যায়। ইহা আমাদের আকাশে আসিয়া কিছুদিন ধরিয়া দেখা দিয়া তাহার পর ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। স্থূল চক্ষে দেখিলে মনে হয় এক উজ্জ্বল পদার্থপিণ্ড আলোকময় মেঘে আবৃত হইয়া মহাকাশে ছুটিতেছে। কখন কখন দুই বৎসর ধরিয়াও কোন কোন ধূমকেতুকে তাহার গতিপথে দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এমন ধূমকেতুও আসে, যাহার উজ্জ্বলতা দিনের আলোতেও ম্লান হয় না।

ইহারা আমাদের আকাশে অতিথিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়মিত আসা যাওয়া করে, কিন্তু অধিকাংশই; মাত্র একবারই আসে, ভবিষ্যতে আর তাহাদের ফিরিয়া আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

যাহারা নিয়মিত আসা যাওয়া করে, তাহাদের মধ্যে হেলীর ধূককেতুই বিখ্যাত। ইহা নিয়মিত প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া আসে। ইহা ১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ খ্রীঃ আসিয়াছিল, আবার ১৯৮৬ খ্রীঃ নিশ্চয়ই আসিবে।

ধূমকেতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নিজের আলোকে আলোকিত স্বচ্ছ গ্যাসের আবরণ। তাহার পরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহার জ্বলন্ত পিণ্ড, উহাকে ইহার

মস্তক বলিলে ভূল হইবে না। ইহার ঝাঁটার মত দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছটী সর্ব্বদাই সূর্য্য হইতে দূরে থাকে এবং ইহার মস্তকটী থাকে সূর্য্যের নিকটে। এই পুচ্ছটী কখন কখন দশ কোটী মাইল দীর্ঘ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে; এক কোটী মাইল দীর্ঘ পুচ্ছ ত অতি সাধারণ ব্যাপার।

ইহার সপুচ্ছ আকার বিরাট হইলেও ইহার উপাদান সমষ্টি অতি অল্প; ফলে ধূমকেতুর পদার্থের ঘনত্ব এত অল্প যে ইহার বিরাট আয়তন ভেদ করিয়া দূর আকাশের তারকামণ্ডলী দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত সঠিক সংবাদ জানিতে পারা যায় নাই। কোন কোন ধূমকেতুর বর্ণচ্ছত্র হইতে মনে হয় ইহাতে অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনজাত ধূমপুঞ্জ সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। ইহার স্বয়ংভূ আলোক ব্যতীত সৌরমণ্ডলে আসিলে ইহার বিরাট ধূমাবরণে সূর্য্যের আলোক আসিয়া পড়ায় ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায়।

পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত দুইদিকে একটু চাপা হইল কেন ?

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল এবং বিষুব রেখা তলস্থ ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। উভয় ব্যাসে প্রায় ২৭ মাইল প্রভেদ। ইহার কারণ বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার।

A B একটী অক্ষদণ্ড (axis)। ইহাতে E ও F দুইটী গোলাকার পিতলের চাকা গলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চাকা দুইটীকে একটী অপরটীর উপর খাড়া ভাবে আঁটিয়া দাও, চাকা দুটীর অধঃপ্রান্ত অক্ষদণ্ডের সহিত শক্ত করিয়া আঁটা আছে, কিন্তু উপর দিকে আঁটা নাই। চাকা দুটীর নীচে অক্ষদণ্ডটীর সহিত একটী কপিকল (pulley) C লাগান আছে। এই কপিকলের সহিত আর একটী চাকা D'র দড়ি দিয়া যুক্ত থাকায় Dকে ঘুরাইলেই চাকা দুটী সহ অক্ষদণ্ডটী ঘুরিতে থাকে।

D'র হাতলের সাহায্যে অতি দ্রুত অক্ষদণ্ডটাকে পাক খাওয়াইলে E ও F চাকা দুটী একটু চাপা অবস্থায় ঘুরিতে থাকিবে। (২য় চিত্র)

পাকের বেগ বৃদ্ধির সহিত চাকা দুটীর মধ্যস্থল ফাঁপিয়া উঠিবার জন্য উহার ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্ত ক্রমশঃ চাপিয়া বসিবে। একটি নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের চারিদিকে বেগে ঘুরিবার ফলে চাকা দুটীর অংশগুলি ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় বলিয়া চাকা দুটীর ঘুরিবার দিকে চাকাগুলি দীর্ঘ হইতে থাকে। এইরূপ ঘুরিবার ফলে
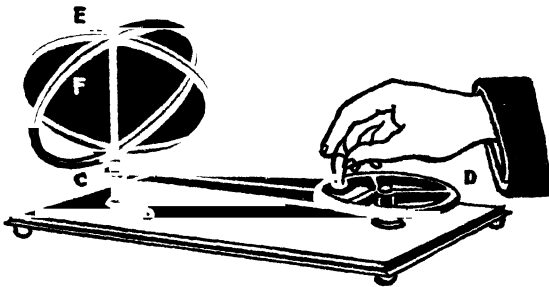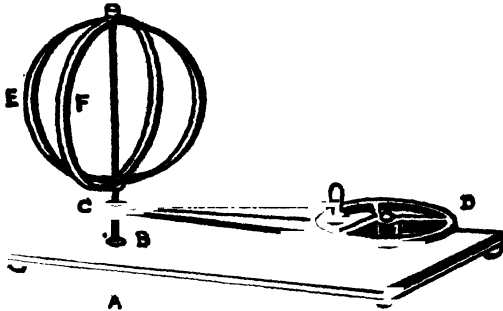
যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে কেন্দ্রাপমুখী বা কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal force) বলে। কোন বস্তু বেগে ঘুরাইলে এই অতিবেগজাত কেন্দ্রবিমুখী শক্তিবলে তাহার অংশগুলি ছিটকাইয়া পড়ে।

কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে সদ্য সূর্য্যগর্ভজাত পৃথিবী যখন কোমল পিণ্ডাবস্থায় ছিল, যখন এইরূপ কঠিন ধারায় পরিণত হয় নাই, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তন হেতু কেন্দ্রবিমুখী শক্তির ফলে পূর্ব্ব পশ্চিম দিক একটু দীর্ঘ হইয়া পড়ায় ইহার উত্তর দক্ষিণ দিক একটু চাঁপিয়া গিয়াছিল। তাহার পর পৃথিবী শীতল হইয়া কঠিন ধরায় পরিণত হইলে উহার উত্তর দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিম অবয়ব ঐ প্রকার দীর্ঘই রহিয়া গিয়াছে।

পৃথিবী কোথা হইতে আসিল?

১৭৯৬ খ্রীঃ প্রথম লাপ্লাস নামে ফরাসী গণিতজ্ঞ প্রচার করেন, যে সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহউপগ্রহাদি সূর্য্যের অঙ্গ প্রসূত। আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণও সূর্য্যের পূজা করিবার সময় বলিতেন জগৎ সবিত্রে অর্থাৎ জগতের প্রসবকর্ত্রী। দ্বিজাতি আর্য্য এখনও আহ্নিক করিবার সময় উক্ত মন্ত্র নিত্য পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ দিয়া থাকেন।

আমাদের পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক পদার্থ (elements) পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব সূর্য্যেও ধরা পড়িয়াছে। অতএব মনে হয় সূর্য্যের মধ্যে আমাদের পৃথিবীও একদিন পিণ্ডাবস্থায় ছিল।

পৃথিবীর গর্ভে কি আছে?

আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত গলিত পদার্থ (lava) দেখিয়া মনে হয় পৃথিবীগর্ভ গলিত ধাতুপূর্ণ। এই গলিত ধাতুর গোলাকার পিণ্ডের উপর একখানি প্রায় ৫০ মাইল স্থূল প্রস্তরের আবরণ ভাসিতেছে। এই ভাসমান আবরণের উপর পার্থিব সাগর, নদ, নদী, অরণ্য পর্ব্বত সমাকীর্ণ যাবতীয় জীবের লীলাভূমি।

পৃথিবীর গর্ভদেশ এত গরম হওয়া সত্ত্বেও মেরুপ্রদেশ চিরতুষারময় কেন?

শীতল পাথরের আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীগর্ভস্থ তীব্র তাপ উপযুক্ত পরিমাণে

উপরে পৌছিতে পারে না। পৃথিবীর উপরিস্থ তাপ কেবলমাত্র সূর্য্য হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাপ্ত তাপ তেমন তীব্র না হওয়ায় মেরুপ্রদেশের তুষাররাশি গলাইতে পারে না।
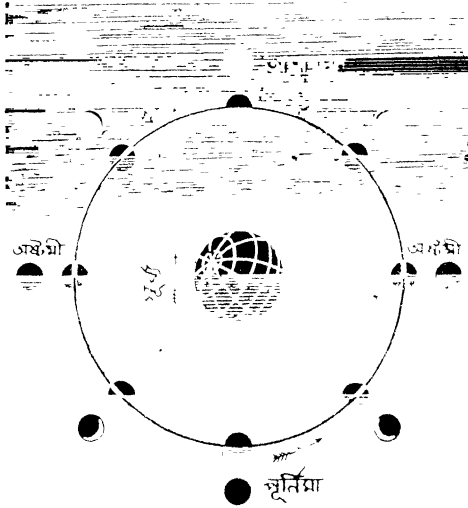
চন্দ্রকলা দিনে দিনে বাড়ে কমে কেন ?

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মাঝে আসিয়া পড়িলে চন্দ্রের সূর্য্যমুখী পৃষ্ঠে সূর্য্যের আলো পড়ায় সে আলো চন্দ্রের ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পৌছিতে পারে না। সে জন্য চন্দ্রকে সে সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিনকে অমাবস্যা তিথি বলে।

তাহার পর দিনে দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক মাঝ হইতে সরিয়া যাইতে থাকে অমনি আবার আমাদের চক্ষু গোচরক্ষম চন্দ্রের আলোকিত ভূপৃষ্ঠের ফালি বাড়িতে থাকে। এই এক এক ফালিকে আমরা কলা বলিয়া থাকি।

অমাবস্থার পরে, প্রথম দিনের চন্দ্রের ফালি এত সরু ও এত অল্প সময়ের জন্য আকাশে দেখা দেয় যে আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ধরাই পড়ে না। এই তিথিকে প্রতিপদ বলে, তাহার পর দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী ইত্যাদি তিথি। তিথি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ফালির আকারও বাড়িতে থাকে এবং আকাশে বেশীক্ষণ দেখিতেও পাওয়া যায়। প্রায় ১৫ দিনের দিনকে পূর্ণিমা বলে। এই দিন পুরা চাঁদ আকাশে দেখা যায় এবং সারা রাত্রিই আকাশে চাঁদ থাকে। এই পক্ষকে (১৫ দিন) শুক্ল পক্ষ বলে। শুক্ল পক্ষে প্রথম হইতে চন্দ্র ঠিক সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে উঠিতে উঠিতে ক্রমে পূর্ণিমার দিনে উঠিবার সময় পূর্ব্ব আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রতিপদের দিন সন্ধ্যায় পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের উপরে চন্দ্রের অতি সরু ফালি উঠিতে না উঠিতে ডুবিয়া যায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের বর্দ্ধিত ফালি দিনে দিনে আকাশের উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অষ্টমীর দিন মাঝ আকাশে উঠে; তাহার পর বাড়িতে বাড়িতে পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বে উঠিয়া সারারাত্র কিরণ দিয়া পশ্চিমে ডুবিয়া যায়।

তাহার পর চন্দ্রের আকার দিনে দিনে এক এক ফালি কমিতে থাকে এবং ১৫ দিনের দিন অমাবস্থায় গিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই পক্ষকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র শুক্লপক্ষের মত ঠিক সন্ধ্যায় উঠে না। পূর্ব্ব আকাশে সন্ধ্যার পরে উঠে এবং দিন দিন এই সন্ধ্যার পরে উঠার সময়ের ব্যবধান বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ সন্ধ্যার বহু পরে উঠিলেও বাকী রাত্রিটুকু আলো দেয় এবং সূর্য্য উঠিলে তবে তাহার আলো সূর্য্যের উজ্জ্বলতর আলোকে চাপা পড়িয়া ক্রমশঃ নিভিয়া যায়। এইরূপে দিনে দিনে চন্দ্রের ফালিও কমিতে থাকে এবং সন্ধ্যার পর উঠিবার সময়ের ব্যবধানও বাড়িতে থাকে। ফলে কৃষ্ণ পক্ষের শেষ দিকে চন্দ্রের সরু ফালি রাত্রি শেষে আমাদের আকাশে কিছুক্ষণের জন্য উঠিতে না উঠিতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উঠিয়া পড়ে।

চন্দ্রের কোন বায়ু মণ্ডল নাই কেন ?

আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার আকর্ষণ ক্ষমতাও অল্প। চন্দ্র সৃষ্টির আদিযুগে ইহার একটী বায়ু মণ্ডল নিশ্চয়ই সৃষ্টি হইয়া থাকিবে ; কিন্তু আকর্ষণ ক্ষমতা অল্প বলিয়া বায়ু মণ্ডলের লঘু পরমাণুগুলিকে চন্দ্র বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ফলে তাহারা মহাকাশে মিলাইয়া গিয়া থাকিবে।

চন্দ্রে বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে কেন ?

চন্দ্রে বায়ু বা জল নাই। আমরা এই দুইটির অভাবে বাঁচিতেই পারি না। সেখানে আমাদের বায়ু মণ্ডলের মত কোন আবরণ না থাকায় দিনে অসম্ভব গরম ও রাত্রে অসম্ভব ঠাণ্ডা। ফলে সেখানে আমাদের মত জীবের বাস করা অসম্ভব।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যোদয় হয় কেন ?

পৃথিবীর আকার গোলোকের মত এবং ইহা অনবরত লাট্টুর মত পাক খাইতেছে। পাক খাইতে খাইতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যের সম্মুখীন হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।

দিনের সময় কি করিয়া জানা যায় ?

সূর্য্যাস্তের সময় জানা থাকিলে দিনের সময় জানা খুব সহজ। সূর্য্যাস্তের সময় দ্বিগুণ করিলে দিনের সময় পাওয়া যায়।

ধর কোন দিন সূর্য্যাস্ত হইল সাড়ে ছটায়, (৬টা ৩০ মিনিটে) তাহা হইলে সেই দিন ১৩ ঘণ্টা সূর্য্যের আলো ছিল।

সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হয় কেন ?

পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিতেছে। সেইজন্য মনে হয় সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তাপ বেশী লাগে কেন ?

তখন সূর্য্য দিক্‌চক্রবালের অধিক উপরে থাকায় সূর্য্যকিরণ খাড়াভাবে

আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। কিন্তু শীতকালে সূর্য্য দিক্‌চক্রবালের নিকটে থাকায় সূর্য্যকিরণ হেলিয়া পড়ে।

সকালে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যের কিরণ হেলিয়া পড়ে বলিয়া তাপ কম লাগে। কিন্তু দুপুরে সূর্য্য আকাশে মাথার উপরে আসায় কিরণ খাড়াভাবে পড়ে বলিয়া তাপ বেশী লাগে। ঠিক এই কারণে, শীতকালে সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাকৃত হেলিয়া পড়ে বলিয়া তাপ কম লাগে তাই শীত লাগে। এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ খাড়াভাবে পড়ে বলিয়া তাপ বেশী লাগে।
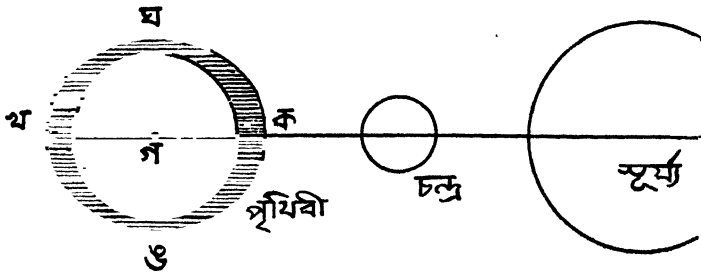
জোয়ার ভাঁটা খেলে কেন ?

চন্দ্র ও সূর্য্যের টানে সমুদ্রের জলরাশি ফাঁপিয়া উঠে। ফলে সমুদ্রের জলতল (level) নদীর সাধারণ জলতল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া পড়ায় সমুদ্রের জল নদীপথে বিপরীত দিকে ডাঙ্গায় প্রবেশ করে। সেইজন্য নদীর জল অধিক হওয়ায় দুকুল ভাসাইয়া দেয়।

অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য এক রেখায় আসে তখন চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের মিলিত আকর্ষণের ফলে জল (ক, খ) খুব বেশী ফাঁপে, তখন খুব বেশী জোয়ার ভাঁটা খেলে। অষ্টমী তিথির কাছাকাছি যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ ৯০ ডিগ্রি তফাৎ হয় (ঘ, ঙ), তখন জোয়ার ভাঁটা সর্ব্বাপেক্ষা কম খেলে।
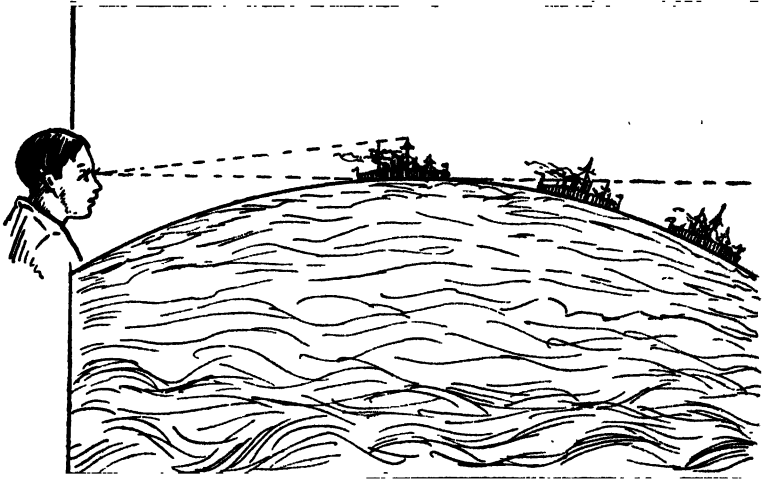
কোন স্থান হইতে দূরের উচ্চ বস্তুর কেবল মাত্র চূড়া প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

দিগন্ত ব্যাপী সমতল ক্ষেত্র পাইতে হইলে সমুদ্রের ধারে কিংবা মরুভূমিতে দাঁড়াইলে পাওয়া যাইবে। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া কোন জাহাজ আসিতে দেখিলে প্রথমেই তাহার মাস্তুলের শীর্ষদেশ আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ে। ক্রমশঃ তাহার অধোভাগ আমরা দেখিতে পাই এবং সর্ব্বশেষে তাহার তলদেশ দেখা দেয়। আবার কোন জাহাজ সমুদ্র পথে যাইবার সময় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমেই তাহার তলদেশ অদৃশ্য হয় তাহার পর ক্রমশঃ তাহার অন্যান্য অংশ ও সর্ব্বশেষে তাহার মাস্তুলের চূড়া অদৃশ্য হইয়া থাকে।

আমাদের পৃথিবী সমতল নহে, আকারে গোলোকের মত বলিয়া এরূপ হওয়া সম্ভব। চিত্রখানি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। পৃথিবী গোল না হইয়া সমতল হইলে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব অনুসারে তাহার আকার ছোট বা বড়

দেখাইত ; কিন্তু তাহা কখনই উল্লিখিত রূপ তলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দৃষ্টির বাহিরে যাইত না।

দিন রাত্রি হয় কেন ?

আমাদের পৃথিবী ঠিক লাট্টুর মত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অনবরত পাক খাইতেছে। পৃথিবীর একবার সম্পূর্ণ পাক খাইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। পাক খাইবার সময় পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ যখন সূর্য্যের সম্মুখে আসে তখন সেই অংশে সূর্য্যের আলো পড়িয়া দিন হয় এবং গোলোকের ঠিক অপর অংশে তখন সূর্য্যের আলোক পৌছিতে পারে না বলিয়া অন্ধকার হয়, সেই জন্য তখন আমরা রাত্রি হইয়াছে বলিয়া থাকি। পৃথিবী পাক খাইবার সময় কোন বিশেষ স্থান হইতে দ্রষ্টা যখন দূর দিক্‌চক্রবালে প্রথম সূর্য্য দেখিতে পায় তখন আমরা বলি সূর্য্য উঠিতেছে। তাহার পর পৃথিবী যত পাক খায়, সূর্য্যও তত মাথার উপরে উঠিতে থাকে ; ক্রমশঃ সূর্য্য মাথার উপরে আসে, তাহার পর পাকের সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা যখন আর সূর্য্য দেখিতে পায় না, তখন আমরা বলি সূর্য্য অস্ত গেলেন। যখন সূর্য্য পৃথিবীর গোলোকের অপর ভাগে থাকে বলিয়া দেখা যায় না, তখন রাত্রি হয়। এইরূপ পাকের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই স্থান সূর্য্যের সম্মুখে আসিলে তথায় দিন হয়। অন্ধকার ঘরে একটি আলোর সম্মুখে একটি গ্লোব রাখিয়া ঘুরাইলে দিন রাত্রি হওয়া বেশ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

দিক্‌চক্রবাল গোলাকার এবং দ্রষ্টার উচ্চতা অনুযায়ী তাহার বিস্তার হয় কেন ?

কোন দিগন্তব্যাপী প্রান্তরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিলে একটী গোলাকার সীমারেখা চোখে পড়ে। এই গোলাকার সীমারেখাকে দিক্‌চক্রবাল (Horizon) বলে। দ্রষ্টার চক্ষু দিক্‌চক্রবালের কেন্দ্র। দিক্‌চক্রবালে মনে হয় আকাশ

নামিয়া ভূমিকে স্পর্শ করিয়াছে; এই মিলন রেখার পারে আর ভূমি দেখা যায় না। দিকচক্রবালের কোন বিন্দু হইতে যদি দ্রষ্টার চক্ষু পর্য্যন্ত একটী সরল
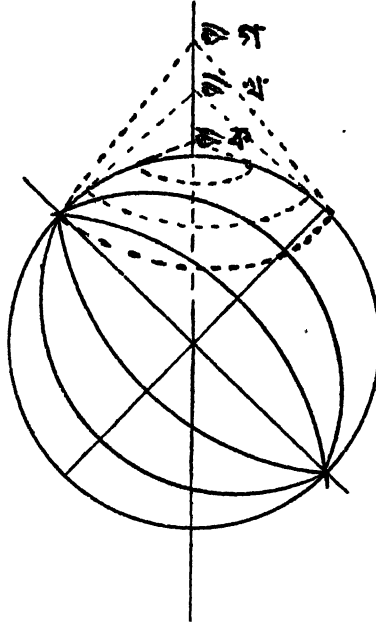
রেখা টানা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টি পথের এই সরল রেখা মাত্র একটী বিন্দুতে ভূমি স্পর্শ করে; এইরূপে যে দিকেই দেখনা কেন দৃষ্টি পথে সরল রেখা টানিলে এই সরল রেখা মাত্র একটা বিন্দুতে দিকচক্রবাল স্পর্শ করে।

দ্রষ্টার চক্ষু ক, যদি সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে মাত্র পাঁচ ফিট উপরে থাকে তাহা হইলে দিকচক্রবাল প্রায় সওয়া দুই মাইল দূরে থাকিবে।

দ্রষ্টা যদি কোন উচ্চ স্থান হইতে চারিদিকে দেখে তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষুর উচ্চতা অনুসারে দিকচক্রবাল দূরে সরিয়া যায়। খ, দ্রষ্টা ৫৬০০ ফিট্ উচ্চ কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া চারিদিকে দেখিলে দিকচক্রবাল প্রায় ৮০ মাইল দূরে

সরিয়া যাইবে। আবার যদি আরও উচ্চে, ২৩০০০ উচ্চে উঠিয়া গ, চারিদিকে দেখিলে দিক্‌চক্রবাল ১৬০ মাইল দূরে সরিয়া যাইবে।

এইরূপ দ্রষ্টার উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌চক্রবালের বিস্তার কেবল পৃথিবী গোলোকের আকার বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে।

বৎসরের ২১শে মার্চ্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর মাত্র ২টি দিনে দিন রাত্র সমান হয় কেন ?

পৃথিবী লাট্টুর মত পাক খাইতে খাইতে একটী নির্দ্দিষ্ট পথে প্রায় সেকেণ্ডে ১৮॥০ মাইল বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই নির্দ্দিষ্ট পথটীর নাম কক্ষ। পথটী প্রায় গোলাকার এবং সূর্য্যটী এই কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে আছে।

লাট্টু যেমন তাহার লোহার পিনের উপর ভর করিয়া পাক খায়; সেইরূপ পৃথিবী তাহার উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্র দিয়া ক খ এক কল্পিত রেখাকে আশ্রয় করিয়া পাক খাইতেছে। এই কল্পিত রেখাকে অক্ষদণ্ড বলে (axis).

অক্ষদণ্ড পৃথিবীর কক্ষতলের (plane of earth's orbit) উপর ঠিক লম্ব (perpendicular) নহে। কক্ষতলের উপর লম্ব ও অক্ষ দণ্ডের কোণের পরিমাণ ২৩॥০ ডিগ্রি। এইরূপ অল্প হেলিয়া পৃথিবী অনবরত পাক খাইতে খাইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে (১নং চিত্র)। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় অক্ষদণ্ডটী একই দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।

উত্তর মেরুর ও দক্ষিণ মেরুর ঠিক মাঝামাঝি পৃথিবীর কেন্দ্র করিয়া এবং অক্ষদণ্ডকে বক্ষোপরি লম্বভাবে রাখিয়া যদি একটী বৃহৎ চক্র আঁকা যায়, তাহা হইলে সেই চক্র পৃথিবী গোলোকের উপর যে রেখাপাত করে সেই রেখাকে বিষুব রেখা (Equator) বলে। বিষুব রেখাকে যে কল্পিত ক্ষেত্র বক্ষে ধারণ করে সেইটীকে বিষুবরেখাতল (plane of the Equator) বলে। এই বিষুবরেখাতল
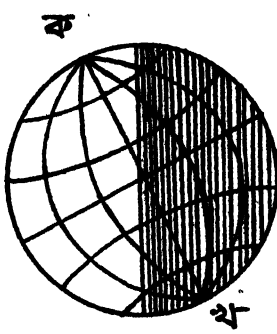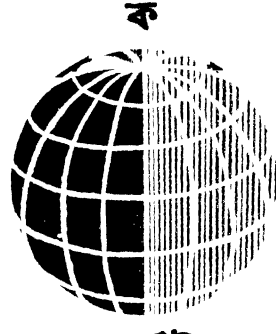
১ নং ২ নং

বিস্তৃত করিলে কক্ষের দুই স্থানে ছেদন করে। কক্ষের ছিন্ন এই দুই বিন্দুকে বিষ্ণুপদ ও হরিপদ বলে (৯৭ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)।

সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে পৃথিবী ২১শে মার্চ্চ বিষ্ণুপদ (vernal Equinox) এবং ২২শে সেপ্টেম্বর হরিপদ (autumnal Equinox) অতিক্রম করে। কক্ষতলে অবস্থিত বলিয়া বিষ্ণুপদ ও হরিপদের দিনে বিষুবরেখাতল সূর্য্য ভেদ করিয়া থাকে, ফলে এই দুটী দিনে অক্ষদণ্ডটী কক্ষতলের উপর লম্ব অবস্থায় উপস্থিত হয়। সেইজন্য এই দুটী দিনে পৃথিবীর সকল অংশে দিবারাত্র সমান হয় (২নং চিত্র)।

দিন রাত্রি বৎসরের নানা সময়ে ছোট বড় হয় কেন ?

[১নং ও ২নং চিত্র দেখ।]

২১শে জুন তারিখে পৃথিবীর অক্ষদণ্ডটীর উত্তর মেরু অংশ সূর্য্যের দিকে ২৩॥০ ডিগ্রি হেলিয়া পাক খায়। এইরূপ ঘটায় দক্ষিণ মেরু প্রদেশ ২৪ ঘণ্টায় মোটেই সূর্য্যের আলো পায় না এবং উত্তর মেরু প্রদেশ ২৪ ঘণ্টায়ই আলো ভোগ করে। এই সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যালোক

থাকে বলিয়া দিন বড় হয় ও রাত্রি ছোট হয়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সূর্য্যালোক অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষণ থাকায় দিন খুব ছোট হয় ও রাত্রি বড় হয়।

আবার ২২শে ডিসেম্বর পৃথিবীর অক্ষদণ্ডটীর দক্ষিণ মেরু অংশ সূর্য্যের দিকে ২৩৷৷০ ডিগ্রি হেলিয়া পাক খায় বলিয়া দক্ষিণ মেরু প্রদেশ ২৪ ঘণ্টা সূর্য্যের আলো ভোগ করে এবং উত্তর মেরু প্রদেশ ২৪ ঘণ্টাই ঘোর অন্ধকারে আবৃত হয়। এই সময় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দিন খুব বড় হয়, রাত্রি খুব ছোট হয় এবং উত্তর গোলার্দ্ধে দিন খুব ছোট হয় ও রাত্রি খুব বড় হয়।

২১শে মার্চ্চ পৃথিবীর সকল স্থানেই দিন রাত্রি সমান হয়। ২২শে মার্চ্চ হইতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে ক্রমাগত দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইতে থাকে। ২১শে জুন তারিখে দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয় ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়।

আবার ২২শে জুন হইতে ক্রমাগত দিন অপেক্ষাকৃত ছোট ও রাত্রি বড় হইতে থাকে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে গিয়া পৃথিবীর সকল অংশেই দিন রাত্রি আবার সমান হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ক্রমাগত দিন ছোট ও রাত্রি বড় হইতে হইতে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়।

তাহার পর আবার ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ক্রমাগত দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইতে হইতে ২১শে মার্চ্চ তারিখে গিয়া রাত্রি ও দিন সমান হয়।

এই সময় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়।

বৎসরে একই স্থানে নানা ঋতু দেখা দেয় কেন ?

পৃথিবীর যে অর্দ্ধাংশ অধিকক্ষণ আলো ভোগ করে সেই ভাগের ভূমিখণ্ড তাতিয়া বায়ুমণ্ডলকে তাতাইয়া তুলে। তখন সেই স্থানে গ্রীষ্মকাল দেখা দেয়। পৃথিবীর বাকী অর্দ্ধাংশে অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষণ আলোক ভোগের জন্য তাপের অভাব ঘটায় শীতকাল দেখা দেয়।

একেবারে হঠাৎ গ্রীষ্ম বা শীত আসিয়া উপস্থিত হয় না। আস্তে আস্তে সকল ঋতুরই প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য সম্পূর্ণ গ্রীষ্মের ঠিক পূর্ব্বের
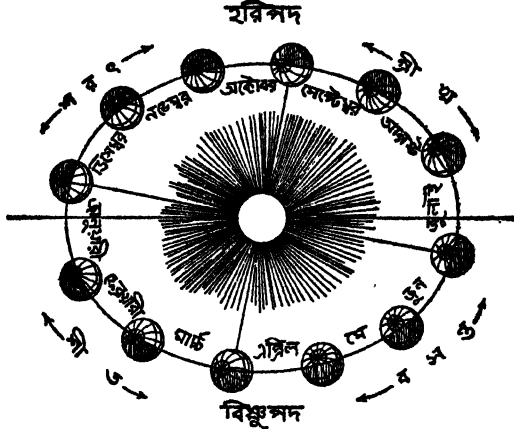
অবস্থা না গ্রীষ্ম না শীত। এই সময়ে ক্রমশঃ শীতের প্রভাব মুক্ত হইয়া নানা জাতীয় লতা-পাতা ফুল ইত্যাদি আবার দেখা দেয়। এই সময়কে বসন্ত ঋতু বলে।

গ্রীষ্মের অত্যধিক তাপের প্রভাবে সমুদ্রের জল খুব বেশী পরিমাণে বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘে পরিণত হইতে থাকে। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে আবার যখন সূর্য্যের আলো অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য সেই গোলার্দ্ধ ভোগ করিতে পায় তখন তাপের অভাবে তথাকার বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায়, মেঘ শীতল বায়ু সংস্পর্শে আসিয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে, ফলে, বর্ষাকাল দেখা দেয়। নিকটে পর্ব্বতাদি উচ্চ ভূখণ্ড থাকিলে বর্ষাকাল আসার বহু সাহায্য করে।

ক্রমশঃ জলভরা মেঘগুলি বৃষ্টিরূপে ধরার বুকে ফিরিয়া আসায় আকাশে মেঘের অভাব ঘটে, এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় পৃথিবীর জলাশয়গুলি হইতে বাষ্পও খুব কম পরিমাণে আকাশে উঠিয়া মেঘের সৃষ্টি করে। ফলে মেঘের অভাবে আর জল হইতে পায় না বলিয়া বর্ষাকাল শেষ

হয়। গ্রীষ্মের অত্যধিক তাপে প্রকৃতির যেখানে স্পর্শকাতর কোমল লতা দূর্ব্বাদি জ্বলিয়া গিয়া ধূলি উড়িতেছিল, সেইখানে প্রচুর জলধারায় ভিজিয়া আবার প্রাণ জুড়ান সবুজের দেখা পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে তপ্ত ধূলিকণারাশি আকাশে উঠিয়া সুন্দর নীল আকাশকে অপরিষ্কার করিয়া তুলে। বর্ষার বারিধারায় আকাশের ধূলি মাটিতে ফিরিয়া আসিলে আকাশের নির্ম্মল সুন্দর বিরাট স্বরূপ আবার লোকে দেখিতে পায়। সমস্ত সৃষ্টি যেন একটা নূতন সজীবতা লাভ করে। এই সময়কে আমরা শরৎকাল বলি।

তাহার পর শীতল বায়ু মণ্ডলে অল্প অল্প হিমের সৃষ্টি হওয়ায় শীতের নিকট আগমন সূচনা করিতে থাকে। এই সময়কে আমরা হেমন্তকাল বলিয়া জানি।

পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে সৌরালোকের অল্পাধিক্যই নানা ঋতুর কারণ।

সূর্য্য ডুবিয়া গেলেও গোধূলিতে আমরা দেখিতে পাই কেন?

পৃথিবীর ধূলিরাশি আকাশে উড়িয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সূর্য্য চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেও তাহার কিরণরাশি আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় ঠেকিয়া যখন ধরার বুকে ফিরিয়া আসে, তখন সেই প্রতি-ফলিত সূর্য্যের আলোয় আমরা দেখিতে পাই। ভোরের দিকেও ঠিক এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে বলিয়া আকাশের এইরূপ ধূলিপূর্ণ অবস্থায় সূর্য্য উঠিবার বহু পূর্ব্বে আমরা আলো দেখিতে পাই।

গ্রীষ্মকালে সকল ঋতু অপেক্ষা বেশী ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে ভাসে। সেই জন্য এই ঋতুতেই গোধূলি বেশ স্পষ্ট ও বহুক্ষণ স্থায়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বিষুবমণ্ডলে (**Equator**)এ ঊষা বা গোধূলি হয় না, সূর্য্য হঠাৎ উদয় হয় এবং অস্ত যায়।

পৃথিবীর কোন কোন অংশ শীতপ্রধান কেন?

পৃথিবীর অক্ষদণ্ড হেলিয়া থাকায় উভয় মেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডগুলিতে

সূর্য্যের আলো সোজাসুজিভাবে পড়ে না। সকাল ও সন্ধ্যার মত হেলিয়া পড়ে। সেই জন্য সূর্য্যের আলোর সকল তাপটুকু ভূমিখণ্ড ভোগ করিতে পায় না। ফলে সেই সকল ভূখণ্ড তাপের অভাবে নিত্য শীত বা বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শীত ভোগ করে।

পৃথিবীর এই অংশগুলিকে হিমমণ্ডল বলে।
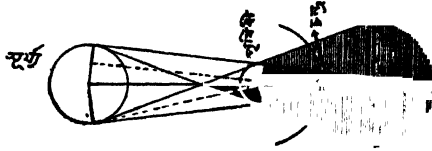
চন্দ্রগ্রহণ হয় কেন ?

পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে এক বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, তেমনি চন্দ্রও পৃথিবীকে প্রায় একমাসে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের সূর্য্যের মত নিজের আলো দিবার শক্তি নাই। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পড়িয়া চন্দ্রকে আলোকিত করিয়া তুলে।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য সমসূত্রে অবস্থিতি করে, তখন সূর্য্যের আলো পৃথিবীর সূর্য্যমুখী পৃষ্ঠে পড়ায় সে আলো ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া চন্দ্রে পড়িতে পায় না। তখন চন্দ্রের উপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। পুরাপুরি ঢাকিয়া ফেলিলে আমরা বলি পূর্ণগ্রাস এবং আংশিক ঢাকা পড়িলে আমরা আংশিক গ্রাস বলিয়া থাকি।

পূর্ণিমার দিন ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

সূর্য্যগ্রহণ হয় কেন ?

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় যদি পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য একই সরল রেখায় থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের সূর্য্যমুখী পৃষ্ঠে পড়িয়া পৃথিবীর দিকে আসিতে পায় না। ফলে আমরা সূর্য্যকে কিছুক্ষণের জন্য দেখিতে পাই না; তাই মনে হয়
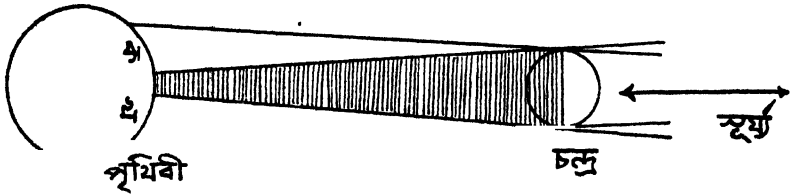
সূর্য্যকে কোন গোলাকার ছায়া ঢাকিয়া ফেলিল। সূর্য্য খুব বড় বলিয়া পূর্ণ গ্রাস হইলেও ক্ষুদ্র চন্দ্র বেশীক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। সেইজন্য আংশিক গ্রাসই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থান হইতে বুঝিতে পারিবে যে অমাবস্যার দিনে সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়া থাকে।

শীতকালের দিন অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের দিন বড় হয় কেন ?

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য শীতকালের অপেক্ষা দিক্-চক্রবালের অধিক উপরে থাকিয়া আকাশে ঘোরে। সেইজন্য তাহার আকাশের ভ্রমণ পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে সূর্য্যের অধিক সময় লাগে।

তুষার সীমা রেখা কি ?

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তর খুব ঠাণ্ডা। যে স্তরের তাপ (temperature) মাত্র শূন্য ডিগ্রি (zero degree centigrade) সেখানে জল বরফের কঠিন আকার ধারণ করিবে, কখনও তরল হইবে না। ইহাকে তুষার সীমারেখা (snow line) বলে। পৃথিবীর দেশ ভেদে তুষার সীমারেখারও ভেদ ঘটে। উষ্ণমণ্ডলে (Tropics) তুষার সীমা প্রায় ১৮০০০ ফুট উপরে ; কিন্তু ইয়োরোপের আল্‌স্ পর্ব্বতে ইহা মাত্র ৮০০০ ফুট উপরে।

আবার মেরু প্রদেশে তুষার সীমা সমুদ্র পৃষ্ঠের সহিত এক ; সেই জন্য মেরু প্রদেশ চির তুষার ভূমি।
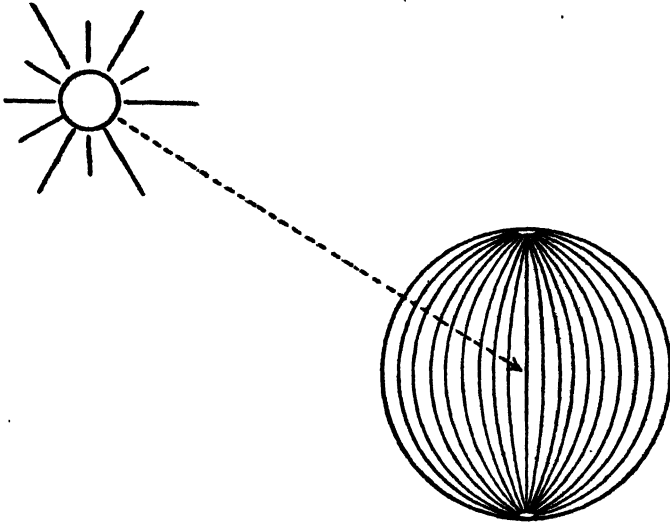
Calcutta time ও Standard timeএর সময়ে ২৪ মিনিট প্রভেদ কেন ?

Standard time মাদ্রাজ মানমন্দিরের সময় অনুযায়ী চলে। এই অনুযায়ী সময় সারা ভারতে চলে ; কেবলমাত্র কলিকাতার নিজস্ব ঠিক সময় আছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর কোন অংশ যখন সূর্য্যের সম্মুখে আসে, তৎক্ষণাৎ সেই অংশে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। স্থান ভেদে সূর্য্যোদয়ও ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়।

আমাদের পৃথিবী গোলককে যদি উত্তর দক্ষিণ চিরিয়া ৩৬০টী ফালি করা হয় তাহা হইলে এক দিনে বা ২৪ ঘণ্টায় এই ৩৬০টী ফালি একবার করিয়া সূর্য্যমুখী

হইবে। তাহা হইলে $\left(\frac{২৪ \times ৬০}{৩৬০} = ৪ \right)$ চার মিনিট অন্তর এক একটী ফালি সূর্য্যমুখী হইবে।

পৃথিবীর যে ফালিতে কলিকাতা অবস্থিত তাহা হইতে ষষ্ঠ ফালি পশ্চিমে মাদ্রাজ নগর অবস্থিত। অতএব কলিকাতায় সূর্য্যোদয় হইবার ২৪ মিনিট পরে মাদ্রাজে সূর্য্যোদয় হইবে; Calcutta time সেইজন্য Standard time বা Madras time হইতে ২৪ মিনিট অধিক।

তারায় ও গ্রহে প্রভেদ কি ?

তারাগুলি এক একটী বিরাট সূর্য্য। পৃথিবী হইতে এতদূরে অবস্থিত যে তাহার হিসাব করা যায় না। সেই জন্য আকাশে তারাগুলির স্থানের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্যই হয় না।

গ্রহগুলি আকারে ছোট। এক একটী পৃথিবী। সূর্য্যের চারিদিকে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য আকাশে ইহাদের স্থানের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটে।

উচ্চ আলোর প্রতি তাকাইয়া থাকিলে আমাদের চোখের তারা ছোট হয় কেন ?

আবশ্যক মত আলো গ্রহণ করিবার জন্য। অতি উজ্জ্বল আলোতে আমাদের চক্ষুর সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলির ক্ষতি হইতে পারে সেইজন্য এইরূপে আলোর প্রবেশ পথ ছোট করিয়া দরকার মত আলো গ্রহণ করা হয়।

চোরা বালি কি ?

শুষ্ক নদী পথে কতক স্থান ব্যাপিয়া খুব মিহি বালি ও নরম পাঁক গর্ভস্থ জলের উপর ভাসিতে থাকে। ইহা এত নরম যে ইহার মোটেই ভার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ফলে মানুষ, গরু, বাছুর কোন জীব এই স্থানকে শক্ত জমি মনে করিয়া

পা দিলেই পুঁতিয়া যায়। চোরা বালিতে পা দিলে আর রক্ষা নাই। যতই পা তুলিয়া লইবার চেষ্টা করা হউক না কেন, ততই বেশী পুঁতিতে থাকে, এইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ পুঁতিয়া গিয়া মারা পড়ে।

উল্কাপাত হয় কেন ?

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত যে মূল সূর্য্য হইতে সৌর মণ্ডলের যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহাদির সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রেও তাই সূর্য্যকে জগৎসবিতা [প্রসব কর্ত্তা] বলা হয়। যখন নানা জগৎপিণ্ড সূর্য্য গর্ভ হইতে একে একে বাহির হইয়া আকাশে নিজের নিজের স্থান করিয়া লইতেছিল, সেই সময়ে বোধ হয় কোন পিণ্ড কোন কারণে নানা বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষের ফলে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। সেই পিণ্ডের অসংখ্য টুকরাগুলি এখনও সৌরমণ্ডলে নিজ নিজ কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর এলাকায় আসিয়া পড়িলে, পৃথিবী তাহার বিরাট আকর্ষণ বলে নিজ বক্ষে এই টুকরাগুলিকে টানিয়া লয়। এইগুলি অতি বেগে আকাশ হইতে ধরাবক্ষে পড়িবার সময় বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বায়ুর সহিত সংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠে। আমরা সেই জন্য উজ্জ্বল পিণ্ড পড়িতে দেখি।

ছোট ছোট পিণ্ডগুলির অধিকাংশই জ্বলিয়া ভস্মে পরিণত হয়। বড় বড় গুলির কোনটী পাওয়া গেলে দেখা গিয়াছে যে ইহার অধিকাংশই বিশুদ্ধ লৌহাদি ধাতু গঠিত।

অধিকাংশ স্থলে উল্কা পতনে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জুন একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ড, ওজনে প্রায় ৩৫০০ টণ, সাইবিরিয়ার এক সুদূর নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া পড়ে। ইহার পতনে পৃথিবীর বক্ষে যে কম্পন উঠিয়াছিল তাহা ৩০০০ মাইল দূরস্থিত ভূকম্পমান যন্ত্রেও ধরা পড়ে এবং ইহার শব্দও প্রায় ৬০০ শত মাইল দূরে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। মাটির সহিত উল্কাপিণ্ডের সংঘাতে এরূপ তাপের সৃষ্টি হয় যে ঐ স্থানীয় তপ্ত বায়ু চারিদিকে

প্রায় ৩৫ মাইল জুড়িয়া স্থানের গাছ পালা ঝলসাইয়া ছারখার করিয়া দেয় ; এবং মাত্র একটি বৃহৎ গহ্বরে তাহার আগমনের চিহ্ন রাখিয়া পিণ্ডটি নিজেও ভাঙ্গিয়া অণু পরমাণুতে পরিণত হয়।

এইরূপ একটি উল্কাপিণ্ড যদি লণ্ডনের মত কোন নগরে গিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে নগরটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পৃথিবী ভেদ করিয়া গর্ত্ত করা সম্ভব কি ?

অসম্ভব। মাটীর নীচে গর্ত্ত করিবার সময় দেখা গিয়াছে প্রতি ৬৬ ফুট অন্তর এক ডিগ্রি করিয়া তাপ বাড়ে। ফলে ২ মাইল নীচেই মানুষের পক্ষে কাজ করা একেবারে অসম্ভব। আরও অধিক নীচে নামিলে, মানুষ ত কোন্ ছার, খুঁড়িবার যন্ত্রই ভূনিম্নস্থ তীব্র তাপে গলিয়া পড়িবে।

পৃথিবীর তিনটী বিখ্যাত খাল কি ?

	নাম	কোথায়	খুঁড়িবার সময়	দৈর্ঘ্য	গভীরতা
১।	সুয়েজ	ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে।	১৮৬৯ খৃঃ	১০১ মাইল	৩০ ফুট
২।	কীল	জার্ম্মণীর মধ্য দিয়া বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের মধ্যে।	১৮৯৫ খৃঃ	৬১ মাইল	৪৫ ফুট
৩।	পানামা	আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে।	১৯১৪ খৃঃ	৫০½ মাইল	৪১ ফুট

সুবিধা—

১। খাল খননের পূর্ব্বে ইয়োরোপ হইতে ভারতে আসিতে হইলে, সারা আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া তবে আসিতে পারা যাইত। ইহাতে আজকালের

তুলনায় অর্থ ও সময় চতুর্গুণ লাগিত। আজকাল তিন সপ্তাহে ইংলণ্ড যাওয়া চলে। এই জলপথ ইংরাজের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্যের চাবি কাঠি ।

২। বাল্টিক সাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে যাইতে হইলে ডেন্‌মার্কের উপকূল দিয়া যাইতে হইত। ইহা জার্ম্মাণীর ব্যবসার পক্ষে যুদ্ধের সময় খুব নিরাপদ নহে, সেইজন্য এই খাল সে নিজের দেশের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার দুই উপকূল এক করিয়া লইয়াছে।

৩। মার্কিণ রাষ্ট্রের আট্‌ল্যান্টিক উপকূল হইতে প্রশান্ত উপকূলে আসিতে হইলে, সারা দক্ষিণ আমেরিকা বেড়িয়া আসিতে হইত। ইহাতে ভাড়া ও সময় আজকালের তুলনায় বহু গুণ লাগিত। পানামা খাল কাটিবার পর সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র তাহার নৌবহর অতি অল্প কালের মধ্যে এক সাগর হইতে অন্য সাগরে লইয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার আক্রমণ ও আত্মরক্ষা ক্ষমতা বহু গুণ বাড়িয়াছে।

সারগাশো সমুদ্র [Sargaso] কি ?

উত্তর আতলান্তিক সাগরে, আমেরিকার দিকে ধূসর রংএর সামুদ্রিক দলের [Sea weed] বহু যোজন বিস্তৃত এক ক্ষেত্র ভাসিতে দেখা যায়। ইহাকেই পোর্ত্তুগিজেরা 'সারগাশো সমুদ্র' নাম দেয়। ইহার মধ্যে অসংখ্য সামুদ্রিক জীব বাস করে। বহু শতাব্দী ধরিয়া নাবিকদিগের ধারণা ছিল যে ইহার মধ্যে জাহাজ একবার ধরা পড়িলে আর তাহার মুক্তি নাই। ১৯১০ খৃঃ মাইকেল সারের নৌঅভিযান ইহার মধ্য দিয়া নিরাপদে পার হইয়া যাওয়ায় ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। আতলান্তিক সাগরের মধ্যে এই স্থানটুকু অতি শান্ত, স্রোতহীন বলিলেও চলে। চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে ইহার চারি পাশ দিয়া নানা সামুদ্রিক স্রোত বহিয়া থাকে, সেই জন্য সমুদ্রে ভাসমান নানা সামুদ্রিক উদ্ভিদাদি স্রোতের মুখে আসিয়া এই স্থানে জড় হয়।

সারগাশো সমুদ্র

মাধ্যাকর্ষণ

ঢিল ছুড়িলে কিছুক্ষণ পরে আবার তাহা মাটিতে ফিরিয়া আসে কেন?

এ নিখিল বিশ্বে প্রত্যেক জিনিষ, ক্ষুদ্র হইতে বিরাট সৌর গোলক পর্য্যন্ত, প্রত্যেকে প্রত্যেককে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে আকর্ষণ করে। বড় জিনিষের টানিবার ক্ষমতা বেশী, ছোটর টানিবার ক্ষমতা তাহার আকারের অনুপাতে কম। এই শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (gravitation) বলে।

এই ক্ষমতার বলে আমাদের পৃথিবী তাহার বক্ষোপরি সকল দ্রব্যকেই আকর্ষণ করে। ফলে আমরা কোন দ্রব্য আকাশে ছুঁড়িয়া দিলে তাহা পৃথিবীর এলাকা ছাড়াইয়া যাইতে না পারিয়া পুনরায় পৃথিবীর বক্ষে ফিরিয়া আসে।

এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত গণিতবিদ্ ভাস্করাচার্য্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গোলাধ্যায় নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক যুগে নিউটন ইহা আবিষ্কার করেন। বাগানে গাছ হইতে একটী ফল মাটিতে পড়িতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের কথা তাঁহার মনে উদয় হয়।

পশু পক্ষীর শাবক শীঘ্র চলিতে পারে, মানুষের শিশু পারে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দুই একটী বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে।

১ম মাধ্যাকর্ষণ।

পৃথিবী একটী বৃহদাকার গোলক। ইহার ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। এই গোলকের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০০ মাইল নিম্নে ভূগর্ভে অবস্থিত। পৃথিবী অবিরাম সকল পদার্থকে ভূকেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। এই ভূকেন্দ্রাভি-মুখী আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। এই মাধ্যাকর্ষণের ফলেই প্রত্যেক পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট ভার অনুভূত হয়। ইহা না থাকিলে আমাদের কোন ভার থাকিত না।

২য় ভার-কেন্দ্র।

প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অংশটির ভার আছে। এই সকল খণ্ডের ভারগুলি মিলিয়া সমস্ত পদার্থের সমষ্টিভার গড়িয়া তুলে। এই ভারের জন্য প্রত্যেক পদার্থের ভার বহন করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে উহা ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া যায়। ধর একটী চেয়ার ; উহার চারিটি পায়া না থাকিলে চেয়ারখানি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। এই পড়িয়া যাওয়া বা না যাওয়া একটি বিশেষ নিয়মের বশে ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত চেয়ারখানির সমষ্টিভার চেয়ারের একটি বিশেষ বিন্দুতে

চাপ দেয়। এই বিন্দুটিকে ঐ চেয়ারের ভার-কেন্দ্র (Centre of gravity) বলে।

৩য় ভার-রেখা।

কোন পদার্থের ভার-কেন্দ্র হইতে সরল রেখা টানিয়া যদি ভূকেন্দ্রের সহিত যোগ করা হয় তাহা হইলে এই কল্পিত রেখাকে ঐ পদার্থের ভাররেখা বলে। প্রতি পদার্থের ভারশক্তি তাহার ভাররেখা ধরিয়া ক্রিয়া করে।

এই ভাররেখা যদি সেই পদার্থের ভার বহনকারী পায়াগুলির পরিসীমার (Perimeter) মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে পদার্থটি মাটিতে কিছুতেই পড়িয়া যাইবে না; কিন্তু কোন অবস্থায় যদি এই ভার-রেখা পায়াগুলির পরিসীমার বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার উপযুক্ত সংখ্যক পায়া থাকা সত্ত্বেও পদার্থটি মাটিতে হেলিয়া পড়িয়া যাইবে।
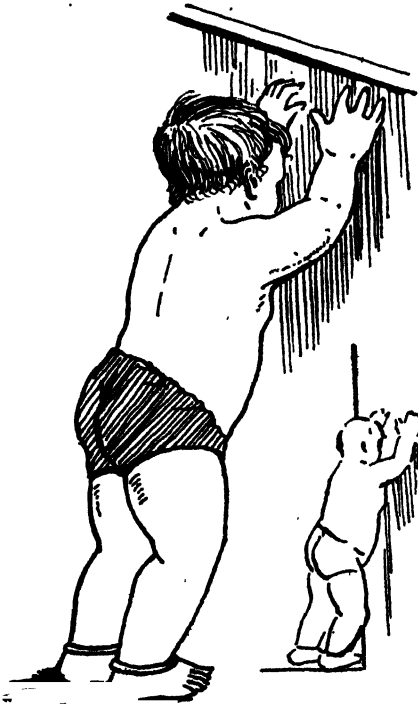
এইবারে মানুষের শিশুর কথা ধরা যাউক। দেহের অনুপাতে মানুষের মস্তকটি অধিক ভারি। শিশুকালে দেহের ভার-কেন্দ্র মস্তকের নিকটেই থাকে এবং উহার ভাররেখাটি শিশুর সম্মুখের দিকে পড়ায়, শিশু দাঁড়াইবার

চেষ্টা করিলেই হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া যায়। প্রায় এক বৎসর পরে শিশু দেহের ভার-রেখা উহার দেহের পিছন দিকে গিয়া পড়ে। শিশুর পদদ্বয়ের মাংসপেশী দৃঢ় বলিয়া সে পিছন দিকে উল্টাইয়া পড়িয়া যায় না। এই কারণে দেহের ভার-রেখা যত দিন না শিশুর পিছন দিকে গিয়া পড়ে, ততদিন শিশু দাঁড়াইতে পারে না।
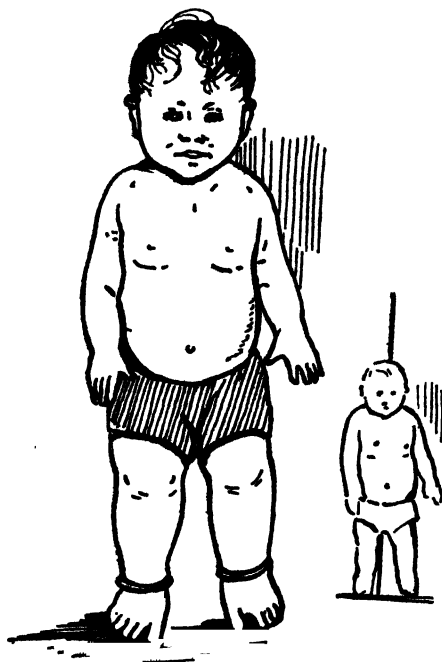
চতুষ্পদের এইরূপ কোন ক্রটি নাই। উহার চারিটি পা থাকায় উহার দেহের ভাররেখা জন্মাবধি তাহার পদচতুষ্টয়ের পরি-সীমার মধ্যেই থাকে, সেইজন্য ভুমিষ্ঠ হইয়াই পশুশাবক দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে পড়িয়া যায় না। সে অতি সহজেই চলিতে শিখে।

প্রতি পদার্থের ভার থাকে কেন?

প্রথমে মাল (Mass) ও ভারে (Weight) প্রভেদ বুঝা দরকার। কোন পদার্থে যতখানি উপাদান আছে তাহাকে মাল (Mass) বলা হয়; ফলে মালের কখন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ভার নির্ভর করে পৃথিবীর আকর্ষণের উপর। কোন পদার্থের ভার একমণ, অর্থাৎ পৃথিবী তাহাকে একমণ শক্তিতে

নিজ কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। ফলে পৃথিবীর আকর্ষণের তারতম্যে পদার্থের ভার অল্পাধিক হইয়া থাকে।

পৃথিবীর আকর্ষণের উপর পদার্থের ওজন নির্ভর করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহার ওজন যত, অন্যান্য গ্রহে সেই পদার্থ লইয়া গেলে সেই গ্রহের আকর্ষণ অনুযায়ী তাহার ওজন অল্পাধিক হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কাহারও ওজন যদি পৃথিবীতে ১ হয় তাহা হইলে

চন্দ্রে		·১৬ হইবে
মঙ্গলে	(Mars)	·৩৮ ,,
বুধে	(Mercury)	·৩৮ ,,
শুক্রে	(Venus)	·৮৬ ,,
উরনাসে	(Uranus)	·৮৮ হইবে
নেপচুনে	(Neptune)	·৮৮ ,,
শনিগ্রহে	(Saturn)	১·১৯ ,,
বৃহস্পতিতে	(Jupiter)	২·৬১ ,,
সূর্য্যে		২৭·৭ ,,
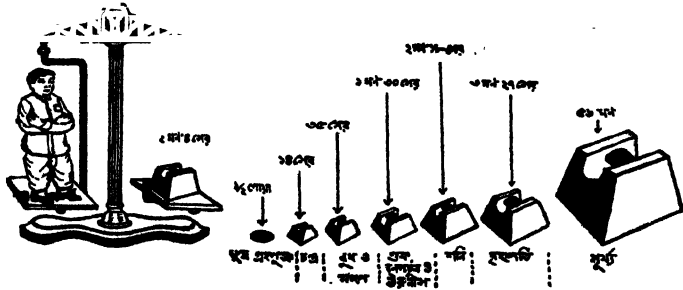
এই অনুপাতে কষিলে দেখা যায় যে কোন পদার্থের ওজন যদি

পৃথিবীতে	হয়	১২ সের
চন্দ্রে	হইবে প্রায়	২ ,,

মঙ্গল ও বুধে হইবে প্রায়		১০ সের
উরণাস, শুক্র ও নেপ্‌চুণে	,,	১০ ,,
শনিগ্রহে	,,	১৫ ,,
বৃহস্পতি গ্রহে	,,	২১ ,,
এবং সূর্য্যে	,,	৮ মণ দশ সের

অন্য গ্রহে যাইতে হইবে না, আমাদের পৃথিবীতে এক স্থানের ওজন অন্য স্থানে অল্পাধিক হইয়া থাকে। বিষুবরেখাস্থিত যে কোন স্থান পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে প্রায় ৭৯২৬ মাইল দূরে এবং পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ মেরুবিন্দু পৃথিবী কেন্দ্র হইতে প্রায় ৭৮৯৯ মাইল। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুবিন্দু বিষুবরেখাস্থিত যে কোন স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও অপেক্ষাকৃত অধিক। সেইজন্য মেরুবিন্দুদ্বয়ে কোন পদার্থের ওজন অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক হইবে। Spring balance দিয়া ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি বিষুবরেখাস্থিত কোন স্থানে কোন পদার্থের ওজন ১৯১ পাউণ্ড হয় তাহা হইলে মেরুবিন্দুতে তাহার ওজন প্রায় ১৯২ পাউণ্ড হইবে।

এই যুক্তি অনুযায়ী হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর গিরিশৃঙ্গ সমতলভূমি হইতে প্রায় ছয় মাইল উচ্চ বলিয়া পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত। সেই জন্য সমতল ভূমিতে কোন জিনিষ ওজন করিয়া গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গে লইয়া গেলে দেখা যাইবে তাহার ওজন কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কোন খনিতে নামিলে ইহার বিপরীত ঘটনা ধরা পড়ে। খনিতে নামিলে পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও মালের ওজন কমিয়া যায়; কেন? খনিতে নামিলে তাহার পদতলের অবশিষ্ট পৃথিবী গোলক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার আকর্ষণও অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। এই অপেক্ষাকৃত অল্প আকর্ষণের ফলে তাহার মাল পূর্ব্বের মত থাকিলেও ওজন অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। যদি পৃথিবীকেন্দ্রে উহাকে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেখানে

মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় পদার্থের কোন ওজনই থাকিত না, কিন্তু তাহার মাল পূর্ব্ববৎই থাকিত।

ওজনের আর একটী রহস্য আছে। পৃথিবী নিয়ত বেগে আবর্ত্তিত হওয়ার ফলে যে কেন্দ্রবিমুখী শক্তির (Centrifugal force) সৃষ্টি হয় তাহার বশে পৃথিবীর উপরিস্থ সকল পদার্থই মহাকাশে ছিটকাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation) সকল পদার্থকে পৃথিবীর বক্ষে টানিয়া রাখে বলিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রবিমুখী শক্তি (Centrifugal force) তাহাকে ছিটকাইয়া ফেলিতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্যে জিনিষের ওজন বাড়ে বা কমে; ইহার বিপরীত কেন্দ্রবিমুখী শক্তির প্রভাবে সেই জিনিষের উপর বিপরীত ফল দেখা দিবে। বিষুবরেখায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কিন্তু কেন্দ্রবিমুখী শক্তির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়।

বিষুবরেখায় ওজন অল্প হইবার দুইটী কারণ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ ভূকেন্দ্র হইতে দূরত্ব অধিক হওয়ায় মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রবিমুখী শক্তি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক। মেরুবিন্দু অপেক্ষা বিষুবরেখায় মাধ্যাকর্ষণ $\frac{১}{৫৭৮}$ ভাগ অল্প এবং কেন্দ্রবিমুখীশক্তি $\frac{১}{২৮৯}$ ভাগ অধিক। কেন্দ্রবিমুখী শক্তি মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত বলিয়া ইহার আধিক্যেও পদার্থের ওজন কমে। ফলে এই দুই শক্তির বশে কোন পদার্থের মেরুবিন্দুস্থ ওজন বিষুবরেখা প্রদেশস্থ ওজনের অপেক্ষা $\frac{১}{২৮৯}+\frac{১}{৫৭৮}=\frac{১}{১৯১}$ ভাগ প্রায় অধিক হইবে। সেইজন্য যে পদার্থের ওজন বিষুবরেখায় ১৯১ সের হইবে, তাহাই মেরুবিন্দুতে লইয়া যাইলে ওজনে ১৯২ সের হইবে।

বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ ওজন বাটখারা দিয়া করিলে চলিবে না, কেন না মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রবিমুখী শক্তিদ্বয় বাটখারা ও উক্ত পদার্থ উভয়ের উপর একই প্রভাব বিস্তার করিবে। এই পরীক্ষা করিতে হইলে spring balance ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত কেন্দ্রবিমুখী শক্তির প্রভাবের আর একটি ফল কৌতুককর। কোন গ্রহের অতিবেগে পাক খাইবার ফলে যদি তাহার কেন্দ্রবিমুখী শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সমান হয় তাহা হইলে সে গ্রহে কোন পদার্থেরই ভার অনুভূত হইবে না।

মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যে লোকের কার্য্যকরী ক্ষমতাও বাড়ে বা কমে। কেহ যদি পৃথিবীতে একমণ মাল বহন করিতে পারে, সে চন্দ্রে গিয়া ছয় মণ বহিতে পারিবে। গ্রহ যদি অধিকতর ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অধিকতর পরিমাণে মাল বহন করা সহজ হইবে। কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে ৫ ফুট লাফাইতে পারিলে চন্দ্রে গিয়া সহজেই ৩০ ফুট লাফাইতে পারিবে।

বিবিধ

আদম কে ?

বাইবেলের মতে মানব জাতির আদি পুরুষ। তাঁহার স্ত্রীর নাম ইভ্। এই প্রথম নরনারী হইতে মানববংশ সৃষ্টি হইয়াছে।

ঈশপ কে ?

গ্রীক গল্প লেখক। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন, পরে তিনি মুক্তি পান। আমাদের দেশের গোপাল ভাঁড়ের মত তিনি একজন রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বিদ্রূপ করায়, দেলফাই মন্দিরের পুরোহিতবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার নামে বহু নীতি-কথা গল্পাকারে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নামে প্রচলিত কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া 'কথামালা' নামে প্রকাশিত করেন।

আর্কবিশপ কে ?

বিলাতের খৃষ্টিয় প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত। বিলাতে দুইজন আর্কবিশপ (Archbishop) আছেন, তাঁহাদিগকে কাণ্টেরবেরী ও ইয়র্কের আর্কবিশপ বলা হয়। তাঁহাদের সম্মান রাজবংশের পরেই। কাণ্টেরবেরীর আর্কবিশপের রাজার অভিষেকে অধিকার এবং ইয়র্কের বিশপের রাণীর অভিষেকে অধিকার আছে। বিলাতের যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের বলিয়া বিবেচিত হয়।

ফারাউ কে ?—প্রাচীন মিশরের নৃপতিগণ ফারাউ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

পিরামিড কি ?—প্রাচীন মিশরের নরপতিদিগের মৃত দেহ রাখিবার প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ বিশেষ। প্রথম পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্ট জন্মিবার ২৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান হইতে প্রায় ৪৯০০ বৎসর পূর্ব্বে। ইহা প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পিরামিডটী ৪৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খুফু নামক ফারাউর মৃত দেহ রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা পাঁচ শত ফুট উচ্চ। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৭০ মণ ওজনের ২৩,০০,০০০ খণ্ড প্রস্তর লাগিয়াছিল। ইহার কেন্দ্রীয় কক্ষের ছাদের জন্য কয়েকটী দেড় হাজার মণ প্রস্তর ব্যবহার করা হয়।

মমী কি ?—নানাবিধ ঔষধের সাহায্যে শুকাইয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া রক্ষিত মৃতদেহকে মমী বলা হয়। মিশরে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের মমী পাওয়া যায়। মিশরের আব্‌হাওয়া অতিশয় শুষ্ক বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের মত আব্‌হাওয়ায় ইহা কখনই সম্ভব নহে।

ফিনিক্স কি ?—একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত খুদিয়া এই বিরাট দৈত্যের মূর্ত্তিটী গঠন করা হইয়াছিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া বালির নীচে ইহার অধিকাংশ এতদিন প্রোথিত ছিল। ১৯২৬ খ্রীঃ ইহার চারি পার্শ্বের বালির স্তূপ অপসারণ করা হইয়াছে।

অলিম্পিক খেলা-ধুলা কি ?

প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে অলিম্পিয়া নগরে গ্রীকেরা এক খেলা-ধুলার উৎসব করিতেন। প্রতি চারি বৎসর অন্তর এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত এবং গ্রীক জাতির সকল সম্প্রদায়েরই ইহাতে যোগ দিবার অধিকার ছিল। এই উৎসবের দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে যুদ্ধাদি হিংসা কার্য্য স্থগিত থাকিত। ইহাতে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড় বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাঁহাকে কেবল একটী মালা উপহার দেওয়া হইত। ইহার আর্থিক কোন বিশেষ মূল্য না থাকিলেও গ্রীসের যে প্রদেশ ও পরিবার ইহা লাভ করিতে পারিত, সেই প্রদেশ ও পরিবারের কীর্ত্তি গ্রীস ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিত। প্রথম উৎসবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা ৭৭৬ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ দিন হইতে গ্রীকবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা হইতেই গ্রীক রাষ্ট্রিয় জীবনে ঐ উৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। যে বৎসর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেই বর্ষকে অলিম্পিয়াড্ বলা হইত। এইরূপে গণনা করিলে ১ম অলিম্পিয়াড্ ৭৭৬ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে, দ্বিতীয় অলিম্পিয়াড্ ৭৭২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে, তৃতীয় ৭৬৮ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। প্রায় ১১০০ বৎসর ধরিয়া এই মহোৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়; তাহার পর ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা উঠিয়া যায়।

বর্ত্তমান কালে এই অনুষ্ঠান ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে প্রথম আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৬ খ্রীঃ) ব্যতীত, প্রতি চারি বৎসর অন্তর পৃথিবীর নানা দেশে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত উৎসব ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন নগরে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসবে হকি খেলায় ভারতীয়গণ সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন।

মারাথন দৌড় (Marathan Race) কাহাকে বলে ?

৪৯০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ইরাণের সম্রাট মারাথনে গ্রীকদিকের নিকট সসৈন্যে পরাজিত হন। এই অভাবনীয় আনন্দ সংবাদ এথেন্স নগরে দিবার জন্য ফিডিপাইডিস্ নামে এক গ্রীক প্রায় কিঞ্চিদধিক ১৩ ক্রোশ পথ ছুটিয়া আসে। এতখানি পথ একটানা ছুটিয়া আসায় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াই যুবকের মৃত্যু ঘটে। আজকাল অলিম্পিক খেলা-ধূলার মধ্যে মারাথন দৌড়ও করান হয়। এই দৌড়ে প্রাচীন কালের মত কিঞ্চিদধিক ১৩ ক্রোশ পথ একটানা ছুটিতে হয়।

Pumice Stone কি ?

আগ্নেয়গিরির গর্ভজাত এক প্রকার লঘু ও ফোঁফরা প্রস্তর। অনেকটা আমাদের দেশের ঝামার মত দেখিতে। পাঁউরুটী যেমন সেঁকিবার সময় বায়ুপূর্ণ হওয়ায় ফোলা জালি জালি হয়, ঠিক সেইরূপ আগ্নেয়গিরির গর্ভে গলিত দ্রব্য অত্যধিক চাপে জলীয় বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় ঠিক পাঁউরুটীর মত ফোলা জালি জালি অবস্থায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরে আসে। তাহার পর শীতল হইলে ঝামার মত দেখায়।

ইহাকে মিহি করিয়া পিশিয়া নানা দ্রব্য পালিশ করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ডাক টিকিটের প্রচলন প্রথম কবে হইয়াছিল ?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক পেনির (প্রায় এক আনা) ডাক টিকিটের প্রচলন হয়।

ভারতের পত্রাদি প্রথম কবে বিমানে প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় ?

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস হইতে ইংলণ্ড হইতে বিমান ডাকে পত্রাদি আসিতে আরম্ভ হয়।

গরম কাপড় কি সত্যই গরম ?

শীতকালে আমরা গরম কাপড় ব্যবহার করি। গরম কাপড় কি সত্যই গরম ? তাহার তাপ কি আমাদিগের দেহকে গরম রাখে ?

শীত করে কেন ? বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে শৈত্য বলিয়া কোন সত্যকার পদার্থ নাই। তাপের অভাবেই আমাদিগের শীত করে। দেহ হইতে অধিক তাপ বাহির হইয়া গেলে, দেহে তাপের অভাবে আমরা শীত অনুভব করি। যেমন গরম দুধ নিজের তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল আকাশে ছড়াইয়া দিয়া কিছুক্ষণ পরে শীতল হয়, ঠিক সেইরূপ আমাদের দেহও তাপ হারাইয়া শীতল হইয়া পড়িলে, তখন আমরা প্রয়োজন মত তাপের অভাবে কষ্ট পাই।

কাপড়ের কাজ দেহের স্বাভাবিক তাপ আকাশে মিলাইতে না দিয়া রক্ষা করা। পশম ইত্যাদির মত বস্তু অতি মন্দ তাপবাহন (conductor); উহা ভেদ করিয়া দেহের তাপ শীতল আকাশে মিলাইতে পারে না। সেই জন্য পশমের জামা পরিধান করিলে শীতকালে আরাম বোধ হয়। সূতীর জামা অপেক্ষাকৃত উত্তম তাপবাহন; ফলে দেহের তাপ উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে, সেইজন্য সূতী বস্ত্রে শীত নিবারিত হয় না।

শক্তি কি ?

পাত্‌লা কাগজ দিয়া কাঠের মোটা গুঁড়ি কাটা যাইতে পারে, ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার ?

এক টুক্‌রা গোলাকার কাগজ যদি কোন যন্ত্র সাহায্যে অতি বেগে ঘুরান হয়, তাহা হইলে এই অতি বেগের ফলে পাতলা কাগজের টুকরা এমন দৃঢ় রূপ ধারণ করিবে যে তখন ইহাকে দিয়া অতি কঠিন ইস্পাত খণ্ডের মত কাজ করান হইতে পারে। কোমল জড়ও অতি দ্রুত গতির ফলে কঠিন জড়ের মত ব্যবহার করে, আবার উহার গতি মন্দীভূত হইলে পূর্ব্বেকার কোমলত্ব লাভ করে। জড়ের এই গুণের জন্য ইস্পাতের করাতের মত পাত্‌লা টিস্থ কাগজ দিয়া কাঠের গুঁড়িও কাটা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দড়ি বা শিকলের দুই মুখ জুড়িয়া দিয়া অতি বেগে ঘুরাইলে নরম দড়ি কঠিন চাকার মত ব্যবহার করে। এইরূপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে লৌহ বা কাঠের চাকার ন্যায় ইহা কিছুদুর মাটিতে ছুটিয়া যাইবার পর, উহার গতির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে, পুনরায় পূর্ব্বের মত নরম হইয়া তালগোল পাকাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

জড়ের এই গুণের জন্য মোমের মত কোমল বস্তু নির্ম্মিত গুলিও বন্দুক হইতে ছুঁড়িলে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া যায়। যে কোন পদার্থ গতি লাভ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাঠিন্য লাভ করে। গোলাগুলি অসম্ভব দ্রুত গতি লাভ করে বলিয়াই উহাপেক্ষা কঠিন বস্তু ভেদ করিতে পারে। গতিই শক্তির একমাত্র উৎস।

টেলিফোন আবিষ্কার করিয়াছিলেন কে ?

আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল নামে (Alexander Graham Bell) এক আমেরিকাবাসী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ বোষ্টন নগরে প্রথম টেলিফোনে কথা কন।

Telegraph যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন কে ?

আজকাল যে যন্ত্রে কাজ চলে, তাহা সামুয়েল ফিন্‌লে ব্রিজ মর্স নামে এক আমেরিকাবাসী ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ইহাই মর্স টেলিগ্রাম নামে খ্যাত।

বাইসাইকেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন কে ?

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কাছাকাছি ইংলণ্ডের ডাম্ফ্রিনিবাসী একটী কর্ম্মকার ইহা আবিষ্কার করেন।

নোবেল পুরস্কার কি ?

আল্‌ফ্রেড্ বার্ণহার্ড নোবেল নামে এক সুইডিস্‌বাসী বৈজ্ঞানিক স্বদেশবাসী গঠিত একটী মণ্ডলীর হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতি বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতি পুরস্কারের মূল্য প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা।

১। পদার্থ বিদ্যায় (Physics) সেই বৎসরে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্ত্তাকে।

২। ঐরূপ রসায়নী বিদ্যায় (Chemistry)

৩। ঐরূপ চিকিৎসা বিদ্যায়।

৪। সেই বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে।

৫। সেই বৎসর বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যিনি সর্ব্বাধিক চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে এই পর্য্যন্ত মাত্র দুইজন ভাগ্যবান নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রথম সাহিত্যে বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিতীয় পদার্থ বিদ্যায় শ্রীযুক্ত রমন্। দ্বিতীয়টী মাদ্রাজবাসী হইলেও তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এইখানে অধ্যাপনা করিবার সময় ঐরূপ সম্মানে ভূষিত হন ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাই নোবেল পুরস্কার এপর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমাদের গৌরবের কথা।

প্রাচীনকালে সাতটি আশ্চর্য্য বস্তু কি কি ছিল ?

১। মিশরের পিরামিড।

২। গ্রীসের ইফিসাস্ নগরে ডায়না দেবীর মন্দির। জনরব এই মন্দিরের ১২৭টী ৬০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ ছিল।

৩। গ্রীস উপসাগরের রোডস্ দ্বীপে আপোলো দেবতার ব্রঞ্জ নির্ম্মিত .০০ ফুট উচ্চ মূর্ত্তি। ইহা বন্দর প্রবেশের মুখে এক পাশে দাঁড় করান ছিল।

৪। গ্রীসে অলিম্পিয়া নগরে বিখ্যাত শিল্পী ফিডিস্ নির্ম্মিত জুপিটার দেবতার স্বর্ণ ও মর্ম্মর গঠিত মূর্ত্তি। ইহার অতুলনীয় কারু কার্য্য মানুষের হাতে গড়া বলিয়া বোধ হইত না।

৫। প্রাচীন ইরাকের রাজধানী ব্যাবীলনের আকাশ উদ্যান। কথিত আছে মহারাণী সেমিরামিসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শূন্যে এই উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল।

৬। এসিয়া মাইনরে হালিকার্ণাসাস্ নগরে নৃপতি মসোলাসের সমাধি সৌধ। ইহা তাঁহার রাণী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৭। মিশরের আলেক্সজান্দ্রিয়া বন্দরের মুখে নাবিকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য আলোক স্তম্ভ (Light house)। ইহা আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল এবং ইহার উপরিস্থ অগ্নিশিখা এক শত মাইল দূর হইতে দেখিতে ওয়া যাইত।

স্পঞ্জ কি ?

এক প্রকার সামুদ্রিক জীব। এই জীব সমুদ্রগর্ভে বাস করে। ডুবুরীরা াদিগকে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়; তাহার পর নানাবিধ উপায়ে পরিষ্কার রিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

সাধারণ আবহাওয়ার লক্ষণ কি ?

(১) আসন্ন বর্ষার লক্ষণ।

যখন সোয়ালো পাখী নীচে নামিয়া উড়ে তখন বুঝিতে হইবে বর্ষা আসন্ন। আসন্ন বর্ষার সময় আকাশের উচ্চ স্তরের শীতল বায়ুস্রোতের জন্য কীট পতঙ্গাদি নীচে নামিয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ভক্ষকেরাও নীচে নামিয়া উড়িতে থাকে।

(২) আসন্ন পরিষ্কার আকাশের লক্ষণ।

যখন মাকড়সা জাল বুনিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে পরিষ্কার আকাশ আসন্ন। পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছির জন্ম বেশী হয়। এই আহারের লোভে মাকড়সা পূর্ব্ব হইতেই জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

শীতে বাদুড় ঘুমায় কেন ?

তখন কীট পতঙ্গ প্রায় থাকে না; খাদ্যের অভাবে ইহারা ঘুমাইয়া থাকে বলিয়া আহারের অভাব তত বুঝিতে পারে না। কেন না পূর্ণ বিশ্রামের সময় ক্ষয় খুব অল্পই হইয়া থাকে।

তিমি কি মাছ ?

না, ইহা মাছ নহে। ইহা স্তন্যপায়ী জলচর জীব। ইহা মাছের মত ডিম পাড়ে না, ইহার দেহে মাছের মত আঁশ নাই। ইহার রক্ত স্থলচর জীবের মত গরম। ইহা নাক দিয়া নিঃশ্বাস লয়।

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ (Tunnel) কোথায় ?

লণ্ডন নগরে মাটির বহু নিম্নদেশে সুড়ঙ্গ কাটিয়া লোহার নল বসাইয়া তাহার ভিতর দিয়া রেলের লাইন পাতা হইয়াছে। ইহাকে (Tube Rail-way) টিউব রেলপথ বলে। এইরূপ একটি রেলপথ লণ্ডনের উত্তর হইতে

দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ মাইলের কিছু বেশী। ইহাই পৃথিবীর র্তম সুড়ঙ্গ পথ।

আলপাকা (Artificial Silk) কি ?

নানা ঔষধের সাহায্যে কাঠ হইতে সাধারণ আলপাকার সূতা প্রস্তুত হয়।

ন্ধক কোথা হইতে আসে ?

ইটালি, সিসিলি, জাপান ইত্যাদি দেশে আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে পাওয়া যায়। আজকাল অধিকাংশ গন্ধক আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী ভূমি হইতে সংগ্রহ করা হয়। সেখানে চূণে পাথরের মধ্যে গন্ধক থাকে। এইরূপ স্থানে নল বসাইয়া অতি তপ্ত জল গন্ধকসিক্ত পাথরের স্তরে প্রবেশ করান হয়। এই গরম জলের তাতে গন্ধক গলিয়া যায়। তাহার পর এই গন্ধকগোলা জল আবার পাম্পের সাহায্যে উপরে তুলিয়া লইয়া গন্ধক বাহির করিয়া লওয়া হয়।

মাছিতে ঘরের শিলিংএ চলিতে পারে কেন ?

মাছির পায়ের তলা ছোট ছোট লোমে ভরা। কোথাও চলিবার সময় এই পায়ের লোমগুলি সেই জায়গায় জড়াইয়া ধরে বলিয়া মাছি নীচে পড়িয়া যায় না।

মৌমাছি মৌচাকের ঘরগুলি ছয়কোণা করে কেন ?

গোল ঘর করিলে মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিয়া যায়। চারি কোণা বা তিন কোণা ঘর করিলে কোন ফাঁক থাকে না বটে কিন্তু তত শক্ত হয় না। ছয় কোণা ঘরে কোন ফাঁক থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মধু রাখিবার স্থান পাওয়া যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত হয়।

রবারে কালি বা পেন্সিলের দাগ উঠে কেন ?

রবার খুব নরম ও সামান্য চট্‌চটে এবং কাগজ খস্‌খসে, নরম ও আঁসযুক্ত সেই জন্য রবার দিয়া কাগজের কোন স্থানে ঘসিলে কাগজের সেই স্থানের সামান্য আঁাস চট্‌চটে রবারের মুখে উঠিয়া আসে এবং ঘসিবার ফলে নরম রবার ছিঁড়িয়া কাগজের ময়লার সঙ্গে রবার হইতে খসিয়া পড়ে। খস্‌খসে কাগজের দাগ রবার বেশী তুলিতে পারে; মসৃণ কাগজে রবার ঘসিলে তত ভাল ফল পাওয়া যায় না। কালি তুলিতে হইলে একটু শক্ত রবার দরকার হয়, কেননা নরম রবার কালির পাকা দাগ তুলিতে অনেক ক্ষয় হয়।

পৃথিবীতে উচ্চতম অট্টালিকা কোনটি ?

আমেরিকার নিউইয়র্ক (New York) নগরে Empire State Building পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা। ইহা উচ্চে ১১৪৮ ফুট ইহাতে ৮৫ তলা আছে। ইহার চূড়ায় জেপলিন জাতীয় খপোত বাঁধিবার মাস্তুল আছে।

ইহা প্যারী নগরীর বিখ্যাত ইফেল স্তম্ভ (Eiffel tower) অপেক্ষা প্রায় ৩০০ ফুট অধিক উচ্চ।

পৃথিবীতে গভীরতম কূপ কোথায় ?

California প্রদেশে ডুটি তৈলকূপের গভীরতা ১০,০০০ ফুট (প্রায় দুই মাইল)। আরও ২০০০ ফুট খুড়িবার ব্যবস্থা আছে।

সমাপ্ত